প্লাইসটোসিনের মানুষ

সাধন দাশগুপ্ত

প্লাইসটোসিনের মানুষ

প্লাইসটোসিনের মানুষ

সাধন দাশগুপ্ত

ঈস্টার্ন বুক এজেন্সি
৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

Pleistocener Manus
(The Story of the man upto
new-stone age)
Sadhan Dasgupta
Price Rupees Seven only
প্লাইসটোসিনের মানুষ
লেখক ঃ সাধন দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯০

প্রকাশক ঃ ঈস্টার্ন বুক এজেন্সী
৮ সি, টেমারলেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ অভিমন্যু দাস

মূল্য ঃ ১২ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সেই লোকটি, তৈমুর বাহিনী আর···

সকাল বেলা হাঁকডাক শুনে দরজা খুলে দেখি সেই লোকটি—যে আমাকে ছেঁড়াপুঁথি জুগিয়ে অনবরত লেখার জন্য তাগিদ দিয়ে এসেছে, আর সঙ্গে টেমার লেনের তৈমুর বাহিনী মানে খোকন-সুনু-বাবলু-তপন-শিবু আর রত্নার দল। হকচকিয়ে বলি, ব্যাপারটা কি ?—লোকটি গম্ভীর স্বরে বলল, ব্যাপার গুরুতর। গুহা মানুষের কথা বলা হয়নি। ওটা বলা দরকার।—আমি মিনমিন করে বলি, কেন? তার কিছু কিছু তো 'হাতিয়ার থেকে যন্ত্র' বইটাতে বলা হয়েছে ; তবে ?—লোকটি ধমক দিয়ে বলে, কিছু-মিছু নয়। ঠিকঠাক বলা দরকার —সঙ্গে তৈমুর বাহিনী সমস্বরে হ্যাঁ হ্যাঁ করে কোরাস তোলে। আমাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে লোকটি বলে, সময় কম। এইটা ধর। যা দিলাম ওটা ধরেই লেখ। শুধু দেখ ঢাউস কিছু যেন আবার না করে ফেলো। এবার চললাম।

ওরা তো চলে গেল। যা ধরতে দিয়েছিল দেখি সেটি একটা মুখ খোলা পুরু লেফাফা। লেফাফাটা খুলে দেখি কতগুলো না-ছড়া-না-কবিতা কিম্ভুত লেখা। মাথা-মুণ্ডু বোঝা বেশ শক্ত। ওগুলো নিয়ে ওলোট পালোট করে দেখি একটা ইতিবৃত্তের ছক যেন উঁকি মারছে। জানি, লোকটা যখন একবার হানা দিয়েছে, তখন কাজ শুরু করতে দেরি করলে আরো তাগিদ ধমকধামক দেবে। সঙ্গে তৈমুর বাহিনীও থাকছে! কাজেই লেফাফার ঐ ছড়াগুলোকে ধরে ধরে টেনে টেনে লিখতে হলো। আর শেষমেশ একদিন তৈমুর বাহিনীর হাতে ওটা সমর্পণ করলাম। এবার আমার হাঁফছাড়ার পালা।

লোকটির ছড়া যেখানে শেষ লেখাও সেখানে শেষ। প্লাইসটোসিন যুগের শেষ ৮০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে, মধ্য প্রস্তর যুগের শেষ হলো ৬০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। আর মানুষ কৃষি জেনেছে ৬০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কিছু পরে, নবপলীয় যুগে। লোকটা মানুষকে বন থেকে ধরে এনে গ্রামের ঘরে ঢুকিয়ে থেমেছে। কাজেই এই বইও ওখানে শেষ।

পরে দেখি, আরে, এর পরের গল্পতো আগেই বলা হয়েছে ;—বলা হয়েছে হাতিয়ার থেকে যন্ত্র, থালীসের গাধা, ফিনিক্সের নবজন্ম, যন্ত্র নিয়ে বইকটিতে। আর তারপরের ঘটনা এটমের সংসার, দেশকাল ও আপেক্ষিকতা আর এই বিজ্ঞান বইগুলিতে।—বুঝলাম লোকটি বিবেচক।

একটা শুধু মজা—এই বইটি আগে লেখা হলেও ছাপা হয়ে আগে এল 'এই বিজ্ঞান'। লোকটি এমন গোলমাল বাধিয়ে গিয়েছে যে ছাপাখানায় ওলোট পালোট ঘটে গেছে।—এ নিয়ে আবার কবে যে ধমকধামক দেবে—সেই ভয়েই আছি।

সাধন দাশগুপ্ত

প্লাইসটোসিনের মানুষ

সূচীপত্র

প্রথম পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়

সংশোধন :

২০ পৃষ্ঠাতে যে ছড়াটি আছে তার শেষ লাইনটি 'পূর্ণ না হয় কুম্ভ কভু ।।'

এই লেখকের বই

বিজ্ঞানের কথকতা :	আলো আরও আলো, রোমাঞ্চকর রসায়ন, ভাষাগণিত।
সনাতন বিজ্ঞান :	প্লাইসটোসিনের মানুষ, হাতিয়ার থেকে যন্ত্র, থালীসের গাধা, ফিনিক্সের নবজন্ম, যন্ত্র নিয়ে।
কোয়ান্টাম তত্ত্ব :	এটমের সংসার (১ম পর্ব), এটমের সংসার (২য় পর্ব)।
আপেক্ষিকতাবাদ :	এলবার্ট আইনস্টাইন : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ, দেশকাল ও আপেক্ষিকতা।
নব বিজ্ঞানদর্শন :	এই বিজ্ঞান
অন্যান্য বই :	মির্জা গালিব, অন্যকুঠার (ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়)।
সম্পাদিত বই :	সমুদ্রভাবনা (ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়)।

প্রথম পর্যায় ঃ যাযাবর হাঁস

কোথা হইতে আইল মানুষ কোথায় ছিল ঘর।
ডারউইনের তত্ত্বে ধর বাঁদর অতঃপর ॥
সেই সে মানুষ সঙ্গে লয় বিশেষ চিহ্ন পাঁচ।
খাড়া দেহ, চোখ, হাত, বাক্য, ঘিলুর ছাঁচ ॥
চারপ্রহরে নরের স্থিতি বছর লাখ সাত।
পহেলা প্রহরে হলেন লেঠেল জগন্নাথ ॥
দ্বিতীয় প্রহরে তিনি কিরাত ধনুর্ধর।
তৃতীয়ে পৃথিবী দেখি তাহারই নির্ভর ॥
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বিশশতকে আসি।
ইতি উতি চাহি ভাবে কোথা যাই ভাসি ॥
প্লাইসটোসিন যুগশেষে যখন ঘর পায়।
পুরানো সেই দিনের কথা বলি এ পর্যায় ॥
মানুষ আইল রে—

বিংশশতাব্দীর শুরুতে আমেরিকার একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের শেখালেন ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব,—শোনালেন মানুষের পূর্বপুরুষ, বলা-যায়, বনমানুষদের অথবা বাঁদরদের।—শোন কথা! মানুষ—যে কিনা সেদিন রেডিও আবিষ্কার করেছে, এনেছে এক্সরে, —টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তারের ঠাসবুনোটে দূরের শব্দকে কাছে এনেছে—আর আছে স্টিম ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক মেশিন, ট্রেন আর মোটর গাড়ি - সেই মানুষের পূর্বপুরুষ বাঁদর? কী ঘেন্না, কী ঘেন্না! আর কী বেয়াদবি! সহরের একদল নামকরা হোমরা চোমরা লোক সেদিন রাস্তায় শোভাযাত্রা করলেন— সঙ্গে ফেস্টুনে লেখা—'আমরা বাঁদর নই, আর আমাদের নিয়ে বাঁদরামো করতে দেবনা।'—সব মিলিয়ে মহা

গোলমাল। শেষমেশ বেচারা মাস্টারমশায়ের আদালতে বিচার হলো। বিচারক মশায় অশেষ গাম্ভীর্য নিয়ে রায় দিলেন—মানুষের সঙ্গে বাঁদরের কোনো সম্পর্ক নেই ; আর আসামীর ১০০ ডলার জরিমানা !

বেচারা ডারউইন ! প্রকৃতির রাজত্বে প্রাণজগতের আবির্ভাব আর তার বিস্তৃতি-অগ্রগতির কথা জানতে চেয়ে তিনি যে প্রমাণভিত্তিক তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করলেন আদালতের এককলমের খোঁচায় তা নাকচ হয়ে গেল। আর আজকের দিনে মানুষ যখন চাঁদে পা দিয়েছে তখন সেইমানুষের সঙ্গে তার পূর্বপুরুষের সম্পর্ক খুঁজে পেতে আত্মীয়তা করতেও তো কী লজ্জা !

আজকের দিনে অাকছার কুইজ প্রোগ্রাম হচ্ছে। মনে করা যাক এরকম একটা আসরে জিজ্ঞেস করা হলো সেই প্রাণীটি কে যে ইচ্ছে করলে পাহাড় সরাতে পারে, একদিনে হাজার হাজার মাইল যেতে পারে, পারে মেঘের উপরে উড়তে, জলের গভীরে সাঁতার দিতে,—যার চোখে খুব ছোট থেকে খুব বড় জিনিসও ধরা পড়ে, একজায়গায় বসে সে শুনতে পারে দূরদূরান্তের খবর, দেখতে পারে সাতসমুদ্দুর, মহাকাশের রঙিন ছবি, যে পারে এই পৃথিবীকে ইচ্ছেমত সাজাতে,—সে প্রাণীটি কে ? না, একোনো রূপকথা উপকথার দৈত্য দানব নয়। এই প্রাণী হলো মানুষ !

অথচ এই মানুষের শরীরে কোনো অস্ত্র নেই। তার থাবা নেই, নখ নেই, শিং নেই, ডানা নেই, নেই পাখনা, গণ্ডারের মত খড়্গ অথবা হাতির মত গোদা পা আর দাঁত। অন্য প্রাণী থেকে এই দুবলা হাবলা প্রাণীর বিশেষত্ব মাত্র পাঁচটি। সে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে —আবার শরীরকে দুমড়ে মুচড়ে অনেক ভাঁজে ভাঙতে পারে ; তার দুটো হাত আছে—যে হাত দিয়ে সূক্ষ্ম থেকে ভারি, সহজ থেকে জটিল কাজ করতে পারে—যার তুলনা আজকের দিনেও কোন ইঞ্জিনিয়ার করতে পারে নি।

তার তীব্র ফোকাস যুক্ত দুটি চোখ আছে– যে চোখের সাহায্যে সে

ত্রিমাত্রিক অবস্থান বুঝতে পারে, পারে রঙ চিনতে, আকার প্রকারের ঠিকমতন আয়তন বুঝতে। আর সে পারে কথা বলতে। পাখিদের মত কিচির মিচির বা জন্তুদের মতো গর্জন নয়। অজস্র অনর্গল কথা —যে কথার অর্থ আছে, ইঙ্গিত আছে, চিন্তার ছোঁওয়া আছে। এক-কথায় মানুষের নিজস্ব এক সচল ধনী ভাষা আছে—যা সে কথার সূত্রে ব্যবহার করতে পারে। আর সবার উপরে মানুষের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব হলো তার মস্তিষ্ক! ফুটবলের খোলে রবারের স্পঞ্জের মত মাথার করোটির মধ্যে একতাল বিবর্ণ ধূসর যে বিশ্রি পদার্থটা আছে সেটির জন্যই মানুষ—মানুষ! এই মস্তিষ্কের আকৃতির জন্য নয়, আকার আয়তনের বিচারে এটি তুলনাহীন। এই মস্তিষ্ক আছে বলেই মানুষ উপকথার দৈত্য-দানবের অদ্ভুত-কিম্ভুত কাজকারবার করতে পারে। করতে পারে যন্ত্র নিয়ে। সে যে ওড়ে, দেখে বা শোনে, জোরে যায়, বা নিচে নামে—সবই সে করতে পারে, সহজেই পারে—কারণ মানুষই একমাত্র প্রাণী যে যন্ত্র গড়তে পারে।

প্রাণীতাত্ত্বিক জগতের মত এই যন্ত্র জটিল থেকে জটিলতর রূপ পেয়েছে। সে যে চাঁদে নেমেছে, মঙ্গলগ্রহ-বৃহস্পতির খবর জেনেছে, হ্যালির ধূম-কেতুর তত্ত্বতালাশে নামছে—এ সব কাজই করছে সেই দুপেয়ে-দুহাতের খাড়া দাঁড়ানো মানুষ। করছে ভাষায় আলোচনা করে, মস্তিষ্কের সাহায্যে, যন্ত্র উদ্ভাবন করে। —যন্ত্রেরও বিবর্তন আছে। আবার ডারউইনের তত্ত্বের মত সারভাইভেল অফ দি ফিটেস্ট বা যোগ্যতমের উদ্বর্তনের মত যন্ত্রেরও টিঁকে থাকা আছে। কাজেই যদি বলা যায়—আদি প্রোটোজোয়া থেকে মানুষের যেমন উদ্ভব—তেমনি আজকের যন্ত্রের আদি পুরুষ হলো একটা চোখামুখ লাঠি—তবে সন্দেহ সংশয় নিয়ে একথা শুনলেও, বোধহয়, আজকাল আর কেউ আদালতে, একথা বলার জন্য, মামলা দায়ের করবে না! তবু কথাটা কিন্তু সত্যি।…

মজা হলো—মানুষের ইতিহাস আর যন্ত্রের ইতিহাস দুটোই পাশাপাশি চলে এসেছে। প্রয়োজনে মানুষ যন্ত্র গড়েছে—যন্ত্র তাকে অগ্রগতি

দিয়েছে—জানিয়েছে অনেক সমস্যা। আবার সমস্যার সমাধানে মানুষ যন্ত্র এনেছে—আবার সে এগিয়ে চলেছে। মানুষের ইতিহাস আর যন্ত্রের ইতিবৃত্ত দুটোই যেন সমান্তর রেখা—যার উপর দিয়ে মানুষের অগ্রগতির রেল গাড়িটি চলে চলেছে! কাজেই যন্ত্রকে বুঝতে হলে মানুষের নিজস্ব গল্পটুকুও শুনতে হয়।

কবে মানুষ এল আর কবে সে যন্ত্র গড়ল—এ দুটো প্রশ্নের উত্তর সঠিক জানা নেই। বলা হয় আজ থেকে দুকোটি বছর আগে পৃথিবীর প্রাণের উদ্ভব। আর মানুষ প্রজাতির আবির্ভাব মোটে সাত আট লাখ বছর! এই যে সাত-আট লাখ বছরের মানুষের ইতিহাস--বিজ্ঞানীরা এটিকে মোটামুটি চারটি ভাগ বা পর্যায়ে ফেলেছেন। প্রথম পর্যায়ে, উচ্চ শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পরিবারের দুই পা-দুই হাত আলা মাটিতে বসবাসকারী যে সব প্রজাতি আদিতে নিজেদের মধ্যে আকছাআকছি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল—আধুনিক মানুষ, যাকে বিজ্ঞানে বলে হোমো-সেপিয়েন্স অর্থাৎ বুদ্ধিমান মানুষ,—তাদেরই একটি বিশেষ শ্রেণী ছাড়া আর কিছু নয়। এছাড়া অন্য শ্রেণী যাদের আদর করে কেউ বলেছে কপিমানুষ, বানর মানুষ, অর্ধমস্তিষ্ক মানুষ বা হোমোনিড---হোমো সেপিয়েন্সদের সঙ্গে লড়াই করে অথবা প্রকৃতির সঙ্গে মোকাবেলা না করতে পেরে তারা সকলেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রায় ছয় সাত লাখ বছর ব্যাপী বিস্তৃত এই পর্যায়। এরই কোনো এক সময়ে হোমো সেপিয়েন্সদের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রাণিতাত্ত্বিক বিচারে এরা ছিল একটি মাত্র অঞ্চলের অধিবাসী—সে অঞ্চল হলো প্রাচীন জগতের অংশ—এশিয়া ইউরোপের আজকের তুষার রেখার দক্ষিণে! নতুন জগৎ বা আমেরিকায় এই প্রজাতি প্রথম পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলে সংশয় সন্দেহ আছে। অথচ অন্য সব প্রজাতি---যারা হোমোনিড বা আধা মানুষ—নানা জায়গায় তাদের চিহ্ন দেখা গেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই প্রথম পর্যায়ের শেষ ঘটে তুষার যুগের শেষে। সেই অসম্ভব কনকনে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে যুজতে গিয়ে

মানুষ একলাফে অনেক কিছু সে যুগে তৈরি করে বসে। এই পর্যায়ে তারা হাতিয়ার তৈরি করেছে, কথাও বলতে শিখেছে। আর এই পর্যায় শেষ হবার আগে তারা আগুনের ব্যবহার শিখেছে। তবু এই পর্যায়ের শতকরা নিরানব্বই ভাগই আমাদের অজানা। কাজেই মানুষের ইতিহাস আর তার যন্ত্রের ইতিবৃত্তের মোটামুটি নব্বুই ভাগই অন্ধকারে ঢাকা।

প্রথম পর্যায়ের শেষে যে তুষার যুগের সৃষ্টি হয়েছিল—তার ব্যাপ্তি প্রায় ত্রিশ হাজার বৎসর—এই সময়টাই মানুষের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়। এই সময়ে মানুষ খাদ্য পাক করতে শিখেছে, উষ্ণ পরিধেয় সেলাই করতে পেরেছে। হাতিয়ারের উন্নতি ঘটিয়েছে—এমনকি তীর-ধনুকও আবিষ্কার করতে পেরেছে। আর পেরেছে শিকারের সঙ্গী হিসেবে কুকুরকে পোষ মানাতে। এসব যোগাড় যন্ত্রের প্রস্তুতির পর প্রাচীন পৃথিবীর শীত প্রধান অঞ্চলের প্রাচুর্যময় শিকার ভূমিতে সে এগিয়ে গেল ;—এমনকি বেরিং প্রণালি পার হয়ে আমেরিকাতেও হাজির হলো। শিকার করা তখন তার কাছে অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আগুনের নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে বলে—তার হাতে তখন খানিকটা অবসর সময় ধরা দিয়েছে। সে তখন ছবি আঁকে, শিল্প কারিগরিতে বিশেষজ্ঞতা পাবার চেষ্টা করে। তবু, এযুগে মানুষ প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করতে শেখেনি। অন্য প্রাণীরা যেমন প্রাকৃতিক জগতে প্রকৃতিকে মেনে নিয়ে টিঁকে ছিল—মানুষও তাই। তফাতের মধ্যে আগুন আর গরম পোশাক থাকায়—যেখানে তার থাকার কথা নয়, সেখানেও অবরেসবরে সে হাজির হয়েছে, অনাহুত হয়ে থেকেও গেছে।—অর্থাৎ প্রকৃতির সহজাত নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করার শুরু হলো এই সময়ে। আর এই সময়েই মানুষের সংস্কৃতির সূচনা। —সংস্কৃতি বলতে যে সব জানা বহুজানা সংজ্ঞা আছে—তা না বলে বরং বলা যায়, সংস্কৃতি হলো---মানুষকে করতে শেখানো হয়েছে বলে যে সব কাজ সে করে বা করে থাকে, তার যোগফল।

মানুষের ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায়ের শুরু আজ থেকে আট হাজার বছর আগে—মোটামুটি খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ সালে। এই সময়ে মানুষ খামারের পশু পোষ মানিয়েছে, কৃষিকাজ শুরু করেছে, জেনেছে পোড়ামাটির ব্যবহার। তারা মাটির বাসন যেমন গড়েছে, তেমনি তামা গলিয়েছে, ব্রোঞ্জকে তৈরি করেছে। চাকার ব্যবহার জেনেছে বলে শকটে চেপে ছুটে গেছে। মুখের ভাষাকে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছে। আর জেনেছে গণনার পদ্ধতি। এমনি করে অতিদ্রুত সাংস্কৃতিক অগ্রগতির রথে ছুটে চলেছে সে। আর ছোটার সময়, হাতিয়ার নিয়ে ভাবনা তাকে বিজ্ঞানের দ্বারে এনে দিয়েছে। সে হাতিয়ার-যন্ত্রের তত্ব খুঁজে বের করতে চেয়েছে। তত্ব যখন পায়, তখন নতুন হাতিয়ার-যন্ত্র তৈরি করা সহজ হয়। এই সময়ে ঘোড়াকে সঠিকভাবে রথে যুজতে পেরেছে মানুষ। আর পেয়েছে লোহা এবং ইস্পাত। এই খুঁজে পাওয়ার পথ ধরে মানুষ পেল মুদ্রা, কামান, মুদ্রাযন্ত্র, গভীর সমুদ্রের জাহাজ, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ। পৃথিবী পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক বাণিজ্য—এসবই পিঠাপিঠি দেখা দেয়। এই পর্যায়ে মানুষ পৃথিবীর সম্পদের অপব্যয় করেছে—সেই প্রাচীন কালের মত, নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে গেছে। প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে অপচয়ের মধ্য দিয়ে এসেছে সংস্কৃতির উন্মত্ত অগ্রগতি। আর তার ফলশ্রুতি হলো প্রকৃতি, মানুষ আর তার সংস্কৃতি—সবই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে!

বর্তমানে, বিশশতকে, আমরা ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায়ের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। টেকনোলজিক্যাল উন্নতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পৃথিবীকে ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছি—তেমনি পৃথিবীকে ধ্বংস করার মুখে দাঁড়িয়ে আছি। প্রকৃতির ভারসাম্য এমনভাবে বিনষ্ট করেছি—যে বেচারা প্রকৃতিকে যদি পৃথিবীর প্রাণজগৎ টিঁকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে হয়, তবে মানুষকে বলি না দিয়ে উপায় নেই। আর অন্য পথ হলো—যেমন পূর্বপুরুষরা মানুষকে একটিমাত্র প্রজাতিতে

পরিণত করেছিল তেমনিভাবে মানুষের সব চিন্তাভাবনা ঝাড়াই বাছাই করে তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ক্ষতি না করে প্রকৃতিকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ;—মানুষের বিবর্তনের গতিকে অব্যাহত রাখা।—এককথায় চতুর্থ পর্যায়ের কাল যে কতদিন হবে তা কেউ বলতে পারে না।

এই সময়টি জানা নেই বলেই, মানুষের অগ্রগতির দ্বিতীয় লাইনটি—যেটি যন্ত্র—তা নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তার শুরু। কারণ আজকের মানুষের সংস্কৃতির সিংহভাগ নিয়ে আছে যন্ত্র, আর তার যন্ত্রণার জন্যই মানুষের প্রকৃতিকে নিয়ে এত ছটফটানি, নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য চিন্তাভাবনা।

চাঁদে পা দিয়ে আর্মষ্ট্রং বললেন—একটি পা ফেলা মানে মানুষের অগ্রগতিতে কত বড় লাফ দেওয়া !—এই পা ফেলা মানুষ বহুবার করেছে। তাতে অগ্রগতির যে সূচনা দেখা দিয়েছে—সেই সূচনা মানুষকে কোথায় নিয়ে এসেছে, নিয়ে গেছে,—সে নিয়ে ভাবনার শুরুও এই চতুর্থ পর্যায়ে।

যন্ত্রের যন্ত্রণা নিয়ে এই ভাবনার উদ্ভব। বিবর্তনের ধারায় যন্ত্রকে নতুন করে চিনতে চাওয়ার চেষ্টারও আরম্ভ এ যুগে।

গ্রীকদের দুটি অমরকাব্য ছিল—ইলিয়াড আর ওডেসী। ট্রয়নগরী ধ্বংস করে গ্রীককূলের নেতা ওডেসিয়ুস বহুদিন ধরে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে নানা বিপদের বাধা কাটিয়ে অবশেষে নিজের দেশ ইথাকায় ফিরে যান। তার যাবার পথের বর্ণনায় যে সব দেশ বা প্রাণীর দেখা পাওয়া গেছে তার সবটাই কল্পনা নয়, রূপকথা নয়। পণ্ডিত মহল এই সত্য আবিষ্কার করেছেন। ওডেসী যেমন সবটাই রূপকথা নয়, তেমনি আবার সবটাই সত্যি মনে করা ভুল। ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে রূপকথা জড়িয়ে আছে। পাহাড় হয়েছে দৈত্য, দ্বীপবাসী অসভ্যরা একচক্ষু রাক্ষস হয়ে দেখা দেয়। মানুষের ইতিবৃত্ত তেমনি এক ওডেসী—যেখানে সব সত্যিকে ছোঁওয়া যায় না, জানা যায় না।—তবু এই

ইতিবৃত্তকে না জানলে চতুর্থ পর্যায়ের চৌকাঠে মানুষকে দাঁড়িয়ে যে থাকতে হবে! কোথায় সে যাবে?—ধ্বংসের পথে; না, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে বিবর্তনের পথে? অতিমানুষ হবার রাস্তায়? এই প্রশ্ন নিয়ে বিংশশতাব্দীর শুরু। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার হাতিয়ারও যন্ত্র।—এও এক যন্ত্রণা!

সেই যন্ত্রণা নিয়ে মানুষ নিজের ইতিহাস খোঁজে—পেছনের চলে আসা যাত্রাপথের দিকে তাকায়; আর সামনে দেখে ভবিষ্যৎকে। পেছনের পথ যে কত অন্ধকার আর কত দীর্ঘ! সামনের পথও যে তাই!…

(কোরাস)………কোথা হইতে আইল মানুষ, কোথায় তাহার ঘর?
ডারবিন সাহেব নিদান হাঁকেন, খোঁজহ বান্দর!
সেই তো মানুষ পা ফেলিল গুহা ছাড়ি চান্দে।
হাতিয়ারের শিকলি দিয়া প্রকৃতিরে বান্ধে।
মানুষ আইল রে—
প্লাইসটোসিনের দরিয়া বাইয়া
মানুষ আইল রে।……

(২) ভাঙা হাঁড়ির হাটে

ডারউইনের এভোলিউশন থিয়োরি বা বিবর্তনবাদ যখন মোটামুটি বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন আর আমজনতা যখন ক্ষুব্ধ হয়ে বাঁদরকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলে অতি অনিচ্ছায় জেনেছে, তখন বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে হঠাৎ ইউরোপে জিনিসপত্রের বিশেষ করে মদের দাম হুম করে বেড়ে যায়। একজন অসুখী জার্মান গীতিকার মহাদুঃখে একটি গান লেখে। যেটি সেদিন জার্মানিতে বেশ পপুলার হয়। জার্মান গানটির অংশ বিশেষের গোত্রান্তরটি হলো—

বাঁদর, তুই গাছেই ছিলি, ল্যাজ খসিয়ে নামলি কেন ভূমে
তুই দাঁত সরালি, খাড়া হলি, ঝরিয়ে ফেলিস লোমে !
শোনরে, বাঁদর, শোন—
তোর রূপান্তরের হ্যাপায় পড়ে আমার ঝক্কি কী ভীষণ !
জাতে মানুষ, ধর্মে বাঁদর এই সরাইখানার মালিক
দাম বাড়িয়ে গ্লাসে বিয়ার এখন ঢালছে অল্পখানিক ।
শোনরে, বাঁদর, শোন -
তোর রূপান্তরটি পূর্ণ হবে কোন যুগে কখন !—

বেচারা নেশাখোর অনামা জার্মান গীতিকার রূপচাঁদ পক্ষীটির দুঃখে আমাদের সমবেদনা না থাকুক, তার মানুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে অবাক হতে হয়। অন্যদিকে তার আশা রূপান্তরের পথে মানুষ আরও উদার সভ্য ভদ্র হবে। তবে এই শেষ রূপান্তরে তারও যে পরিবর্তন ঘটতে পারে সে সম্ভাবনাটুকু তার নেশার চোখে ধরা পড়েনি।—সে যাক। এই গান জানাচ্ছে বাঁদরদের এক লাঙুলহীন শাখা গাছ ছেড়ে মাটিতে নেমেছিল—তাদেরই একশ্রেণী থেকে মানুষ প্রজাতির আবির্ভাব !—এই সংবাদ কতটা সত্যি ?
মানুষের ইতিহাসের প্রথম পর্যায় কালের সাত আট লাখ বছরে কি ঘটে গেছে তার হদিশ জানতে গেলে নিদেন পক্ষে দু'তিন লাখ বছর তো লাগেই। এত সময় কোথায় ? অন্যদিকে যে সব মালমশলা খুঁজে পেতে নিয়ে এই যুগের ইতিহাস তৈরি হবে তা এতই ছিঁটে ফোঁটা—নগন্য যে, বলা যায়, এই পর্যায়ের শতকরা নিরানব্বই ভাগ আমাদের অজানা। কাজেই মানুষের ইতিহাসের পুরো নব্বুই ভাগ অন্ধকারে ঢাকা। তবু অন্ধকার সরিয়ে যে টিমটিমে আলোর শিখাটুকু ধরা যায় তা হলো—সেকালের রোমন্থন কোনো কোনো প্রজাতি এখনো করে চলেছে। তাছাড়া ফসিল আর নানা জাতের হেতের কংকালের গুদামখানা হাতড়ে পাওয়া তথ্য। সেই সামান্য সূত্রটুকু হাতে নিয়ে আজকের মানুষ তার পূর্বপুরুষের সন্ধানে ডিটেকটিভি

করতে বেরিয়ে পড়ে !—বিশ্বের সেরা ডিটেকটিভ গল্প লেখা শুরু হলো ডারউইনের কাল থেকে। তার আগে অবশ্য ইতিউতি খোঁজখবর নেওয়া চলেছিল ; তবু জবরদস্ত তত্ত্ব দিলেন ডারউইন !

আমাদের আদিম দিদিমা—যার বংশে মানুষ গরিলা শিম্পাঞ্জী—এসবের উদ্ভব—বিজ্ঞানীরা তাকে ডাকেন ড্রাইয়োপিথেকাস। এই ড্রাইয়োপিথেকাস কোন এক বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ দেশে থাকত না। কেউ বলেন এরা মধ্য ইউরোপে থাকত, কারো মতে উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া অথবা হিমালয় চীনের মালভূমিতে এদের বসবাস বিচিত্র নয়।

আমাদের এই পূর্বপুরুষের হাবভাব আর চালচলন অন্য প্রাণীদের থেকে তফাৎ ছিল। সে সময়ে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। উত্তরে জমাট বাঁধা বরফের পাহাড় ধসে গলে দক্ষিণে নেমে আসছে। পাহাড়ের উপর শীত বাড়ছে। বনজঙ্গলে যে পূর্বপুরুষরা ছিল—সেখানেও ঠাণ্ডা জমাটি হয়ে আড্ডা গাড়ছে। তবে দক্ষিণে তখনো ঠাণ্ডা নামেনি, সে সবজায়গা কিছুটা গরম।—দেখতে দেখতে গাছগাছলার পরিবর্তন ঘটে। ডুমুর আঙুর—সরে সরে দক্ষিণে আসে। কতগুলো গাছ শীত সইতে না পেরে পাতা ঝড়িয়ে মরার মত ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলের গাছপালা সবই দক্ষিণে সরে যেতে থাকে। আর জঙ্গলের এই দক্ষিণমুখী যাত্রা দেখে সে যুগের প্রাণীদলও একটিমাত্র শ্লোগান মেনে নিয়ে রওনা দেয়—শ্লোগান হলো, চলো দক্ষিণে ! দক্ষিণে সবাই যেতে পারে না। হাতির পূর্বপুরুষ মাসটোডন তার বিরাট শরীর নিয়ে অতটা পথ থপথপিয়ে যেতে পারে না বলে লোপ পায়। তলোয়ার মুখো বাঘ—যে কিনা আমাদের পূর্বপুরুষদের খেতে খুব ভালবাসতো—তারাও দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। —সত্যি ! এই পরিবর্তনের কালে এটাই পূর্বপুরুষ বনমানুষের কাছে একমাত্র খুশখবর।—তবে তাদেরও অনেকে পালিয়ে বাঁচলেও অনেকে ঠাণ্ডা আর বেঁচে থাকার জন্য পরিশ্রমে মারা গেল।

সবাই কি আর পরিবর্তনকে মানিয়ে নিতে পারে?—যতদিন যায়, গাছে বসা বাঁদরের মত বনমানুষরা দেখে বন ফাঁকা হয়ে আসছে, খাবার কমে যাচ্ছে ; এমন কি ঝাঁপ বা দোল খেয়ে এক গাছ থেকে যে আরেক গাছে যাবে সেই সম্ভাবনাও দ্রুত কমে আসছে। বাধ্য হয়ে তারা মাটিতে নামে। মাটিতে নামা মানে, ভীষণ ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত শ্বাপদ কূলের মুখোমুখি হওয়া। আততায়ীর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করাও তখন জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদে সেদিনের সেই বনমানুষদের অনেকেরই চালচলন বদলাতে হলো। আবার অন্য একদল দক্ষিণে হাঁটা প্রাণীকূলের সঙ্গে হেঁটে লাফিয়ে অপসৃয়মান জঙ্গলের দিকে চলে গেল। তবে প্রথমদলের বনমানুষরা একটু আলাদা প্রকৃতির গোঁয়ার গোবিন্দ-জাতের বলে, তারা আর দক্ষিণে গেল না। গাছপালা কমে যাওয়াতে তাদের ভয় নেই। এতদিনে তারা হাঁটতে শিখেছে, তবে শিশুর মত পায়ের তলের বাইরের কিনারায় ভর দিয়ে হাঁটা—মানুষের মত পায়ের তলের মাঝখান দিয়ে নয়। তাছাড়া আরো অনেক কাজ সে রপ্ত করেছে। গাছে থাকতে সে শিখেছিল ফলপাড়া, বাসাবাঁধা আর ডালভাঙা। আর পরে শিখল যে জিনিস হাতে পায় না—সেটি ডাল ভেঙে তাই দিয়ে পাড়তে। অর্থাৎ হাতকে বাড়ানোর পদ্ধতিটি আবিষ্কার করে ফেলে। বাদাম ভাঙার কাজ তারা করে গেল পাথর ঠুকে। সামনের পা দুটো তখন আস্তে আস্তে অন্য কাজে রপ্ত হচ্ছে বলে হাত হয়ে দাঁড়ায়। মাংসপেশির সংস্থানও বদল হবে।—অন্যদিকে খিদের জ্বালায়, ফলপাকুর না পাওয়ায়, তারা প্রথমদিকে পশুপাখিদের খাবার চুরি করে খেতে থাকে। আজকের বাঁদররা যে জোরজুলুম, চুরি করে খাবার খায়—সেটি সেদিনের ট্রাডিশন—যা আজকেও সমানে চলেছে।—এবার তারা ভাঙা ডাল দিয়ে গর্তখুঁড়ে নিজেরাই পোকা-মাকড় সংগ্রহ করে খেতে লাগল। পাথর দিয়ে ঠুকে কঠিন জিনিস ভেঙে ভেতরের পোকার বাচ্চা বের করতে পারলো ;—সে পোকার

বাচ্চা খেতে তাদের কী যে ভাল লাগে !—এককথায় ইঁদুরের মত দাঁত নেই, অথচ মানুষ গর্ত খুঁড়তে পারে ; কাঠ ঠোকরার মত ঠোঁট নেই অথচ বাদাম-ডিম ভাঙতে পারে। পারে কারণ তাদের সামনে তখন দুটো হাত। আর হাতের মুঠোয় আছে ভাঙাডালের লাঠি অথবা পাথর। পোকামাকড়-পাখিপশুর ছানার স্বাদ পেয়ে এদিকে সে মাংশাসী হয়ে উঠেছে। তবু ফলমুল খাবার বনেদি অভ্যেসটুকু সে ছাড়তে পারেনি। অন্যদিকে সেই শীতের রাজ্যে তাদের শত্রু তলোয়ার-মুখো বাঘ নেই, ভয় পাবার মত বিরাট আকারের মাসটোডন নেই। বাকি যারা আছে—তাদের মোকাবেলা করতে গিয়ে দেখে, একা নয় একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ালে শত্রুর মুখোমুখি যেমন হওয়া যায়, তেমনি যায় অন্যজন্তু শিকার করা। তাদের অপরিণত মস্তিষ্ক থেকে এই চটজলদি হিসেবটা তারা শিখে নিল।

অন্য লাঙ্গুলহীন বনমানুষ যারা আরও দক্ষিণে গেল, তারা শিখলো কি ভাবে আরো ভাল করে গাছে চড়ে থাকতে হয়। হাত ছাড়া পা দিয়ে আঁকড়ে ধরতে তারা জানলো। সেই জঙ্গলে বিপদ অনেক বেশি বলে তাদের গায়ের জোর প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তাদের শরীর ভারি হয়। শরীর ভারি বলে তারা গাছে থাকতে অস্বস্তি বোধ করে।—তাদেরও গাছ থেকে নিচে নামতে হলো। অথচ তারা হাতটাকে হাতের কাছে পেয়েও তার মর্যাদাটা বুঝলো না বলে গরিলা শিম্পাজী হয়ে বনমানুষ হয়েই থাকলো। আর উত্তরের বনমানুষেরা ফলমূলমাংস খেয়ে, একজোট হয়ে থাকতে শিখে হাতের ব্যবহার জেনে আর ভাঙা ডাল ও পাথর নিয়ে শীতের কঠিন আবহাওয়ায় মরে না গিয়ে আরো তাড়াতাড়ি মানুষ হবার পথে এগিয়ে যায়। হায়রে, ড্রাইয়োপিথেকাস দিদিমার নাতিদের আকার প্রকার আলাদা হয়ে গেল। একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরায় বিবর্তন।

তবে এই সর্বভূখ বনমানুষদের দল—যারা আমাদের পূর্বপুরুষ—তারা কিন্তু দেখতে মোটেই সুশ্রী ছিল না। বাঁদর হনুমানদের যে শ্রী

আছে—সেটুকুও তাদের নেই।—তারা দুপায়ে থপথপ করে টলেটলে হাঁটে ঠিকই। তবু চারপায়ে চলা বাদ দেয়নি। দেহের নিচে পায়ের অংশটা গোটা শরীরের আন্দাজে ছোট। হাঁটুর কাছে পা দুটো হাঁটবার সময় বেঁকে থাকত। হাত দুটো কি করবে, কোথায় রাখবে ঠিক করতে না পেরে—কেমন যেন ঝুলিয়ে রাখতো অথবা মাথায় তুলে দিতো। চলার সময় চোখের ভঙ্গী সব সময়ে নিচের দিকে খাবার সন্ধানে দৃষ্টি দিয়ে আছে—তবু তিড়িক বিড়িক এদিক ওদিক তাকিয়েও দেখে। ল্যাজ নেই ঠিকই। তবু দেহ লোমশূন্য নয়। মুখের দাঁত বাঁদরদের মত—তার উপর শ্বদন্তগুলো বিরাট। চোয়ালের নড়াচড়া করার অবস্থাটা কম বলে কথা বলার সুযোগ নেই। কপাল ক্রমশঃ নেমে আসা, তার উপরে শুঁয়োপোকার মত কোঁচকানো ভুরু। তার নিচে চোখের গর্ত। ঘাড় ছোট। বুক আর কাঁধ চওড়া। ভয়ানক গুণ্ডা গুণ্ডা গাট্টাগোট্টা চেহারা। সবমিলিয়ে রূপকথার রাক্ষস যেন। আজকের দিনে তাদের দেখা পেলে দৌড়ে পালানোটা স্বাভাবিক। তবে পূর্বপুরুষ ভেবে তাদের রেয়াৎ না করে আজকের মানুষ তাদের মেরে ফেলতেও পারে!

তবে একটা ব্যাপারে এই বনমানুষরা বিশেষ হয়ে থাকে। তারাই প্রথম জঙ্গলের আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। চার পায়ের জায়গায় তারা দুপায়ে হাঁটলো অথবা হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলে বলে বেড়ালো। গাছের জীব হয়ে সে মাটিতে নামলো। সে এমন সব খাবার খেল—যা কিনা তার কস্মিন কালে খাবার কথা নয়। শুধু তাই নয়। তার খাবার যোগাড়ের কায়দা কেরামতিও আলাদা। বাঘ সিংহের মত সে একা শিকার করে না। বুনো কুকুরের মত একজোটে যায়। তবু বুনো কুকুরের দলের মত একদিক থেকে আক্রমণ করে না। কেমন যেন ব্যূহ তৈরি করে চীৎকার গর্জন করে শিকারকে ঘিরে ফেলে মারে।—মারে; কারণ সে হাতের মালিক। হাত আছে বলে নখী শৃঙ্গী দন্তী না হয়েও অসমসাহসে শিকার করে মাংস খেতে পারে।

হাতে আছে পাথর আর গাছের ভাঙা ডাল।—এই ডালই সে বেছে নেয়। সে জানে যে গাছের ফল ছোট, তার ডাল পলকা। যে গাছ ফলে ভরা তার ডাল শক্ত। যেমন নিম ডালে দাঁতন হবে, আর পেয়ারা ডালে ডাণ্ডাগুলির ডাণ্ডা—সেই ইতিবৃত্ত সে জেনে ফেলেছে। তবে এ জানার কালে ডাল থেকে বেশ কয়েকবার যে তাকে পড়তে হয়েছে তার প্রমাণ না থাকলেও—এ ঘটনা নিশ্চয় সত্যি। এই ডাল নিয়ে ভাবনাটাই তার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচিপত্রের প্রথমটি।
ভারতীয়রা এবং চীনদের অধিবাসীরা কোনো শুভ অনুষ্ঠানে পূর্ব পুরুষদের স্মরণ করে, তাদের খাদ্য পানীয় নিবেদন করে। আর আজকের বিজ্ঞানীরা মানুষের এই পূর্বপুরুষের তালাস করে। খাদ্য পানীয় নৈবেদ্য অবশ্যই দেয় না,—তবে তাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। ভাবে কেমন ছিল সে, কোথায়, কি ভাবে সে বেঁচে থেকেছে, টিঁকে থেকেছে অথবা হারিয়ে গেছে! বিজ্ঞানীদের এসব চিন্তা ভাবনা দেখে অন্যেরা ভাবে শুধু শুধু বাঁদুরে পূর্বপুরুষদের খুঁজে সময় নষ্ট করে কি লাভ! চার পাশের মানুষদের মধ্যে বাঁদুরে প্রবৃত্তির অভাবটা কোথায়?
তবে তো সেই জার্মান নেশাখোরটির গানের আর একটি স্তবকের কথা বলতে হয়। যেখানে সেই লোকটি গাইলেন,

এক বাঁদরে ট্যাক্সো কাটে আন্‌বাঁদরে শাসন
একটু এদিক ওদিক ঘটলে জোটে তর্জন আর গর্জন,
শোনরে, বাঁদর শোন
তোর রূপান্তরে স্বাধীন কি হই পক্ষীটি যেমন!—

—পাখির মত স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছে সব মানুষের। তবু পাখি কি স্বাধীন? আবার আমাদের পূর্বপুরুষ যে বিদ্রোহী হলো বলে জানানো হলো—সে বিদ্রোহ তবে কিসের জন্য?—না, ঐ নেশাখোর লোকটি ডারউইনের তত্ত্বটিকে বোধহয় বিলকুল গুলিয়ে ফেলেছে।—পূর্বপুরুষের বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার কথা দুটো নিয়ে বিচার না করে আর স্বস্তি নেই।

এ দেখি এক ভারি অস্বস্তিকর অবস্থা।

(কোরাস) ··· দক্ষিণে চলো, দক্ষিণে চলো,—বেজায় নামে শীত—
প্লাইসটোসিন যুগে ওঠে এ এক সংগীত!
ড্রাইয়োপিথেকাস নাতির দলের হাড়ি হইলো ভাগ।
উত্তরেতে কেউবা রয়, কাহার দক্ষিণ দিকে তাক!
হিমবাহ ঢল্যে নামে আর নামে প্লাবন,
মুশকিল আসান চাহি কপি স্বরে বিবর্তন!

(ধুয়া)··· মানুষ আইল রে—
প্লাইসটোসিনের দরিয়া বাইয়া
মানুষ আইল রে!

(৩) বারো ভুতের খপ্পরে

আইসল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীদের এক চমৎকার উপকথা আছে। শীতের সময় তুষার ঝড়ের দেবতা দেখে ওকগাছ মাথা উঁচু করে ঝড়ের তোয়াক্কা না করে দাঁড়িয়ে আছে। ভারি রাগ হলো তুষার দেবতার। তিনি জঙ্গলের সব ওক গাছ ভেঙে দিলেন। অমনি ওক গাছের নিচে থাকা পাইন আর ফার গাছ শনশন করে বেড়ে গেল। সেই গাছে যে সব কাঠঠোকরা পাখি থাকত, যারা খেত পাইন বা ফারের বাদাম, তাদের তখন মহোৎসব। অন্যদিকে ওক গাছে যেসব চিল পেঁচা বাদুর থাকত, তারা গৃহহারা উদ্বাস্তু হয়ে দাঁড়ায়। চিল ভয়ানক বনেদি পাখি—সে কিছুতেই নিচে নামে না। তাছাড়া তার ঠোঁট দিয়ে সে ফার-পাইনের বাদাম ভাঙতে পারে না বলে, তার খাবার জোগাড় করাটাও খুব কষ্টের হয়ে দাঁড়ায়। তুষার ঝড়ের দেবতাতো এসব দুঃখ কষ্টের কথা ভাবেন নি। তার দুমকরে রাগ হয়েছিল বলে ওক গাছের বংশ শেষ করে চলে গেছেন। তারপর একদিন এলেন রোদের দেবতা। চিল তার কাছে ধরে পড়ে—তার

উঁচুবাড়ি চায়—সেই বাড়ি দিতে পারে এক গাছ। সেখানে চড়ে অনেক দূরের শিকারের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে ;—খাবার জোগাড় সহজ হয়। রোদের দেবতা বললেন তথাস্তু। অমনি আবার এক গাছ আসে—আর চিল পেঁচা বাদুরের পুনর্বাসন ঘটে !

গল্পটাতে আরো একটু তথ্য যদি যোগ করে দেওয়া যায়—তাহলে দেখা যাবে ফারগাছে যে ক্রসবিল জাতীয় কাঠঠোকরা থাকে—সে কিন্তু পাইনগাছের বাদাম ভাঙতে পারবে না—কারণ তার ঠোঁট তত মজবুত নয়। আবার পাইন গাছের কাঠঠোকরা ফার গাছের কাণ্ড ভেঙে উইভিল পোকার গুটি বের করে খেতে পারবে না। ফলে পাইন গাছে থাকে পাইন ক্রসবিল আর ফার গাছে ফার ক্রসবিল।—আরো একটা তথ্য হলো এই কলকাতায় আগে বড়বড় গাছ ছিল—চিলও ছিল। তারা প্রায় মানুষের হাতের খাবার ঠোঙা ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। বড় গাছ নেই বলে কলকাতায় আর চিল তত দেখতে পাওয়া যায় না। অন্য দিকে বড় বাড়ি থাকলেও, চড়ুইয়ের মতো চিল পরের বাসায় থাকা পছন্দ করে না। এককথায় পাখিরা নির্দিষ্ট গাছের জঙ্গলে থাকে—কারণ সেই জঙ্গল তাকে খাবার জোগায়, বাসস্থান দেয় ; আবার আহার্যের গুদামও তাদের হলো গাছ। গাছের সঙ্গে যেন শিকল বাঁধা পাখি। এই শিকল খাবার-থাকার আংটা নিয়ে গড়ে ওঠা।—যেমন দেখা যায়, মেরু ভল্লুক—সে ঠাণ্ডা ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাকে আবার সুমেরু অঞ্চলে দেখা যায়—কুমেরুতে নয়। কারণ ভারি শরীর নিয়ে সাঁতার কেটে তার কুমেরুতে হাজির হওয়া সম্ভব হয়নি—অথচ থপথপিয়ে হেঁটে সে সুমেরুতে যেতে পারে। অন্যদিকে পেঙ্গুইন পাখি একদা উড়তে জানতো বলে, আর এখন সাঁতরাতে পারে বলে দিব্বি কুমেরুতে থাকতে পারে—তার অসুবিধে নেই।

পৃথিবীতে প্রায় দশলক্ষ রকমের ভিন্ন ভিন্ন জীব আছে। সবাই নিজের নিজের জগতে চলাফেরা করে—কেউ থাকে জলে, কেউ ডাঙায়, কেউ

জঙ্গলে। কারো দরকার আলোর, আবার পেঁচার মত অনেকে আলো সহ্য করতে পারে না। কারো দরকার আগুনের মত গরম বালি, কেউ চায় ঠাণ্ডা জলা জায়গা। একেক জায়গায় যেমন স্বাগতম নোটিশ টানানো, অন্য জায়গায় তার আবার প্রবেশ নিষেধ। সব প্রাণী যেন প্রকৃতির সঙ্গে শিকলে বাঁধা—তারা কেউ স্বাধীন নয়। ইচ্ছেমত কেউ কোথাও যেতে পারে না, থাকতে পারে না ; ইচ্ছেমত খাবারও পেতে পারে না।

শুধু তফাৎ হলো মানুষ নামের জন্তু। মানুষের কাছে প্রকৃতির কড়াশাসন চলে না—প্রবেশ নিষেধের বেড়া সে ভাঙতে পারে। খাদ্য-শৃঙ্খল, বা বাস-শৃঙ্খল অথবা আহার্য মজুত শৃঙ্খল—যা প্রাণী জগতকে বেঁধে ছেঁদে রেখেছে—ড্রাইয়োপিথেকাস দিদিমার এক নাতি চুপিসারে সেই মজবুত শৃঙ্খল ভাঙতে শুরু করে। পৃথিবীতে কেউ যদি স্বাধীন থাকে—সে মানুষ। তবে সে স্বাধীনতার কতটা যথেচ্ছাচারিতা আছে —সে গল্প আলাদা !

এই স্বাধীন হতে চাওয়া নাতির দল আজকের পৃথিবীতে নেই। তবু বিজ্ঞানীরা তাদের তত্ত্বতালাশ করেন। এঁদের অবস্থাটা অনেকটা সুকুমার রায়ের হযবরল'র বেড়ালের গেছোদাদার খোঁজের হিসেব কষার মত—কোথায় কোথায় ছিল, কোথায় কোথায় গেছে, কোথায় কোথায় থাকতে বা যেতে পারে তা নিয়ে আঁকজোক কাটা। এই পূর্বপুরুষদের নমুনা নেই ; পাওয়া যেতে পারে হয়তো কিছু হাড়গোড়। আর সেই হাড়গোড় দেখে ঘেটেঘুঁটে বিজ্ঞানীরা জানতে চান ঐসব আদি বানর মানুষ বা এপম্যান হলো বানর থেকে মানুষের রূপান্তরের মাঝখানের হারানো সূত্র অথবা লিংক। এই মিসিং লিংকদের বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হলো পিথেক্যানথ্রপাস। গতশতাব্দীর শেষ দিকে বিজ্ঞানী হেকেল হিসের টিসেব কষে একটা ফতোয়া দিলেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সুন্দা দ্বীপে এদের হাড় পাওয়া সম্ভব। আর এই সম্ভাবনাটিকে সত্য করতে ওলন্দাজ

অধ্যাপক ডক্টর ইউজিন ডুবোআ আমস্টারডামের সুখের চাকরি ছেড়ে সাত সমুদ্দুর পারে সুন্দা দ্বীপে চলে যান। দিন যায় বছর যায়। অবশেষে হেকেলের জানানো মিসি লিংক এর হাড় পান ডুবোআ। এদের নামকরণ ঘটে পিথেক্যানথ্রপাস ইরেকটাস—মানে খাড়া হয়ে চলা বানর মানুষ। আর কিছু পরে পিথেক্যানথ্রপাস আর মানুষের মধ্যকার আর এক হারানো সূত্র পাওয়া গেল চীনের চো-কো-তিয়েন নামে গুহায়—একেবারে আস্ত এক ক কাল। বিজ্ঞানীরা এর নাম রাখেন সিনানথ্রপাস। এদের গুহায় পাওয়া গেল পাথরের অস্ত্র আর আগুনের ছাই।

পাথরের অস্ত্র আর গাছের ডালের গদা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শক্তির বাড়বাড়ন্ত ঘটে। এখন সে আর ফলমূলের ভরসায় রয় না—সে দূরেও যেতে পারে। সে আর ছোরাদাঁতী বাঘের খাবার হতে রাজি নয়। তাছাড়া তার কাছে আগুন এসে গেছে।—তবে সে তো পরের কথা!

ড্রাইয়োপিথেকাস দিদিমার ছেলের বংশের দুজনের খোঁজও এসময়ে পাওয়া যায়—একজন হলো প্রোকোনসাল—পূর্ব আফ্রিকায় বাস ছিল। সে সবে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে—তার বড় বড় শ্বদন্ত বোঝায় সে মাংসটাংসও খেত হয়তো। আর অন্যটি হলো ভারতীয় শিবপিথিকাস; এদের শ্বদন্ত ছোট; মানুষের মতো। হয়তোবা শিবভক্ত বলে নিরামিষাশী!

পিথেক্যানথ্রপাসের নানা ঘরানার খোঁজ যখন এদিকে সেদিকে পাওয়া যাচ্ছে তখন উত্তর পরিধিতে আরেক বনমানুষমুখো মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল—হোমো নিয়্যানডারথালেনসিস বা নিয়্যানডারথাল-মানুষ! এরা এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ যাদের অনেকে হোমো সেপিয়েন্স বা পূর্ণমস্তিষ্ক মানুষের কাছাকাছি; আবার তাদের সাদৃশ্য রয়েছে সিনানথ্রোপাসের সঙ্গে। অর্থাৎ সে বিবর্তন ধারার প্রান্তিক পূর্ণমস্তিষ্ক প্রতিনিধি। অথচ এরা সম্পূর্ণ খাড়া হতে পারতো না। আর

এরা বাস করত গুহায় এবং কখনো কখনো মৃতদেহের কবর দিত! এই নিয়্যানডারথাল মানুষদের কাছাকাছি সময়ে হোমোসেপিয়েন্সদের আবির্ভাব—যাদের আদর করে বিজ্ঞানীরা বলেন শিশুমুখ মানুষ। এদের মুখমণ্ডল ছোট, উঁচু মস্তিষ্ক, মাথার সামনের ভাগ সমুচ্চ। এরা অনেক বেশি স্বাধীন হয়ে পৃথিবীর এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়লো; নির্বিবাদে পিথেক্যানথ্রপাসদের খতমও করে। কারণ আদিম বানর মানুষরা পাথরের ব্যবহার জানলেও, সত্যিকারের হাতিয়ার তৈরি করে সম্ভবত এই শিশুমুখ মানুষরা।—তাদের হাতেই চোখা লাঠির সার্থক ব্যবহার।—একটা লম্বা চারাগাছ কেটে সেটাকে প্রয়োজন মতো চোখা করতে গেলে ধারালো অস্ত্রের প্রয়োজন। ভাঙা পাথর বা শিলীভূত কাঠের টুকরোতে এই অস্ত্রের কাজ চলতে পারে—যেমন আদিম বনমানুষ-মুখো মানুষরা করেছে। তবে সত্যিকারের ধারালো পাথরের অস্ত্র ফ্লিন্ট দিয়ে তৈরি হতো। মজার ব্যাপার হলো ধারালো ফ্লিন্টের টুকরো স্বয়ং প্রকৃতি মানুষের হাতে জুগিয়ে দিয়েছে।—জলের আঘাতে পিণ্ডাকার ফ্লিন্ট ভেঙে যায়—পাওয়া যায় ভাঙা বোতলের মাথার মতো ধারালো অস্ত্র। নদীর ধারে মানুষ তা কুড়িয়ে পায়। বাস, তাই দিয়ে সে চোখা-মুখ লাঠি তৈরি করতে পারে।—সেই হলো তার প্রথম যন্ত্র বা হাতিয়ার। আর এইখানেই তার প্রকৃতি শৃঙ্খল ভাঙার শুরু। নিজেকে নষ্ট করার অস্ত্র মানুষ নামক শত্রুর হাতে কেন যে প্রকৃতি দিল! আশ্চর্য!

(কোরাস)…… প্রকৃতির শিকল ভেঙে স্বাধীন হতে চাইল যারা।
তারা সেই বানর মানুষ এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়া ।।
কোথা যে ছিল তারা সেই হিসেবের নানান আঁকে ৳
হেকেল জানায়, ডুবোআ খোঁজে সুন্দা দ্বীপে জাভার ফাঁকে ।।
নানান জাতের মানুষ হাজির হারানো সেই সূত্র তবু।
অনেক খোঁজার তালাশ টেনেও পূর্ণ না হ কুত্র কভু ।।

(ধূয়া)… … মানুষ আইল রে—
প্লাইসটোসিনের দরিয়া বাইয়া
মানুষ আইল রে !

(৪) যত পাথুরে প্রমাণ

আজকের মানুষ-শিশু যেমন হাতের কাছে যা পায় তা ভাঙতে চেষ্টা করে, দাঁত দিয়ে জিভ দিয়ে দেখে, দেখে কতটা খাবার যোগ্য,—সে দিনের মানুষেরও সেই কাজ। সে খালি এটা ওটা ভাঙে, আর তার খাই খাই প্রবৃত্তি। এই খিদের জন্য অন্য প্রাণী কিভাবে খায়, খাবার জোগাড় করে—তাই লক্ষ্য করে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এখানেও তার তুলনা নেই। আর কোনো প্রাণী অনুকরণে এত দক্ষ নয় আরো একটা কাজ সে করতো। প্রয়োজন ঘটলে জাতভাইদের মাংস খেতে তার ঘেন্নাপিত্তি বা দ্বিধা ছিল না। এককথায় তাকে নরমাংস ভোজী রাক্ষস বলা যায়।—ছিঃ !—তবু তার কি কোনো উপায় ছিল ? এটাও যে অনুকরণের একটা অংশ ! সেদিন বাঘরা মানুষ খেতো না ? তবে ? গ্রীকদের পুরাণ ওডিসির দ্বীপবাসী অসভ্যরা বড় বিশ্রী দেখতে ছিল। তাদের হোমার বললেন রাক্ষস। আমাদের পুরানে রামায়ণ মহাভারতে বিশ্রী লোকগুলোকেও রাক্ষস বলা হলো। ড্রাইয়োপিথেকাস দিদিমার নাতিরাও বড় বিশ্রী ছিল দেখতে। গরিলা-শিম্পাঞ্জি-বেবুন এদের চেহারা তো দেখি। অন্যদিকে যে সর্বভুখ বনমানুষের দল—যারা আমাদের পূর্বপুরুষ—তাদের যা চেহারা ! তারা আবার লাঠি আর মুগুর হাতে নিয়ে ফ্লিন্ট খুঁজতে বেরুলো।

ফ্লিন্ট ভারি মারাত্মক অস্ত্র। ইস্পাত আবিষ্কারের আগে সব ধাতুর চেয়ে বেশি কঠিন ছিল ফ্লিন্ট। ফ্লিণ্টের তৈরি তীরের ফলা ধাতুর তৈরি ফলার চেয়ে প্রাণীদেহের মাংসে যে গভীর ভাবে ঢুকতে পারে সে পরীক্ষা প্রায় সত্তর বছর আগে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়েছে। পিণ্ড ফ্লিন্ট উপর থেকে পড়লে ভাঙে, তাপে ভাঙে ; তখন ব্যবহারের উপযোগী ধারালো টুকরো পাওয়া যায়। সেই টুকরো দিয়ে চারাগাছ নামানো আর তার মাথা চোখা করে তোলা—বাস, এটুকু তো কাজ। সেই কাজের ফলে মারবার খুঁড়বার লাঠি হাতে এসে গেল। এরপর ফ্লিণ্টের টুকরোটুকু সে রাখতেও পারে, ফেলে দিতেও পারে।—প্রথম দিকে গোদা মানুষরা টুকরোগুলো ফেলে দিয়েছে। রাখবে কোথায় ? তাদের না আছে ঘর বাড়ি, না ট্যাঁক বা পকেট। পোশাকই নেই। পরে অবশ্য এসব টুকরো টাকরা এক জায়গায় জমিয়ে রেখেছে। ফ্লিন্ট জমানো হলো তাদের জমার খাতায় প্রথম দফা।

আদিম মানুষ যে ফ্লিণ্টের টুকরো কাটাকুটির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে তার প্রমাণ হলো অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এখনো ঠিক তাই করে। চার্লস মাউণ্টফোর্ডের তোলা দুটি অসাধারণ ডকুমেণ্টারি ফিল্ম নাম Walk about আর Tsurunga তে দেখা যায় জীবন্ত মানবফসিলগুলো অমার্জিত ফ্লিন্ট দিয়ে খুঁড়বার লাঠি বর্শা করছে, গাছের গুঁড়ির বাঁকানো খণ্ড থেকে খোদাই করে নৌকো বানাচ্ছে। চোখা লাঠি দিয়ে মানুষ মূলকন্দ আর গর্তবাসী প্রাণীদের খুঁড়ে তুলতে পারলো। তাছাড়া পারে কচ্ছপের খোলা ভেঙে ফেলতে ; আবার সাপ ইঁদুর জাতীয় ধীরগতি প্রাণী মারতে। এটি তার কাছে লাঠি আবার শাবল। সেই খুঁড়বার লাঠি আরো একটু লম্বা আর আরো একটু চোখা করলে সে তখন বর্শা। এই বর্শা দিয়ে সে বন্য গরু হরিণ ছাগল মারতে পারে। অদ্ভুত ছিল তাদের বর্শা ছোঁড়ার নিপুণত্ব—যার প্রমাণ মাউণ্টফোর্ডের তোলা ফিলমে আছে ;—

তাসমানিয়ার অধিবাসীরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিটার দূর থেকে একটা সিকি ইঞ্চি তক্তাকে বর্শা মেরে ফুটো করে দিতে পারে। কাজেই পঞ্চাশ ষাট কেজি ওজনের পশুমারাটা তাদের কাছে মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। শিকারের পর কাজ হলো মৃত পশুর ব্যবস্থা করা। তখনো তারা আগুনের ব্যবহার জানে না। শুধু জানে মৃত পশু তাদের খাদ্য জোগাবে। পশু যদি বড় আর ভারি হয়, আর তাদের হাতের ফ্লিন্ট যদি ধারালো থাকে, তবে সেইখানেই দিব্বি মাংস কেটে খেয়ে নিতো। বাকিটা বয়ে নিয়ে যেতো। যদি বেশ বড় হয়, তবে ?—আফ্রিকার পিগমিরা হাতিকে ঘায়েল করে তার পেছনে ধাওয়া করে এখনো যায়। হাতিটি রক্তঝরিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে মারা গেলে গোটা দলটা সেখানে বসেই মাংস খেতে থাকে। মাংস অখাদ্য না হওয়া পর্যন্ত ভোজটা চলতেই থাকে। তিয়েরাগেলফুয়েগোতে সমুদ্রের ধারে আটকে পড়া তিমির মাংস খেতে দূর দূর থেকে রেডইণ্ডিয়ানরা এই সেদিনও হাজির হতো। অবশ্য এরা বনভোজনের মত মাংস রেঁধে খেতো। এসব ভোজ দিব্বি দুচার সপ্তাহ চলতে পারে।—তবে শিকার করার সময় দলের সবাই যে আদিম কালে জুটেছে তা বলা যায় না। তাছাড়া এমনও হতে পারে—শিকার যেখানে মারা গেল তার কাছাকাছি জল নেই। কাজেই পশু শিকারের পর, তাকে কেটে কুটে আনাটা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, এবার মানুষ কাটাকুটির অস্ত্র বানাবার ফন্দিতে মাতে ; এর আগে সে যখবার হাতিয়ার করেছে ফ্লিন্ট দিয়ে। এবার সে করল ছোরা। বালি দিয়ে সে সব ছোরা বা ছুরির ধার বাড়ানো হলো। ভাল করে খেতে হলে তার কোনো না কোনো রকম ছুরির দরকার। আর সামাজিক ভোজনের বড় কথা হলো খাদ্য ভাগ করে নেওয়া। কাঁচামাংস, শক্ত মাংস কাটতে যেমন ছোরা-ছুরি, তেমনি দরকার ক্ষমতার। আদিম মানুষের দুটোই ছিল। যেমন তার ভীম ভীম চেহারা—তেমনি ভীমের মত কাঠের মুগুর আর ছোরা।—
ছুরি ছাড়া মানুষের অস্তিত্বই তখন বিপন্ন ! ফ্লিণ্টের ছুরি আর বর্শা

হাতে হাওয়ার উজানে গুঁড়ি মেরে অনায়াসে শিকারের কাছে গিয়ে তাকে মার, কাট, বয়ে নিয়ে যাও, আর খাও।—একলহমায় মানুষ বাঘ হয়ে গেল। শুধু বাঘের লাফটা দিল হাতের বর্শাটা, আর বাঘের শ্বদন্ত হলো তার ছোরা।—হাতিয়ার তৈরির কারখানা চালু হয়ে গেল।

(কোরাস)...... ফ্লিণ্ট খুঁজিয়া গড়িল দেখি বর্শা মনোরম।
আর গড়িল ছোরাছুরি কুঠার দুর্দম ।। বাহারে হোমোনিড!
হান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা, নকল করেঙ্গা।
জন্তু মারো, নইতো খিদেয় নিজেই মরেঙ্গা। আহারে হোমোনিড!
শিকার করা সহজ যে হয়, মাংস কাটা সত্বর।
তবুও খেতে পেতে লাগে সময় যে বিস্তর ।। কেনরে হোমোনিড!

(ধুয়া)...... মানুষ আইলরে
প্লাইসটোসিনের দরিয়া বাইয়া
মানুষ আইলরে!

(৫) বাঘ তাড়ানো শীতে

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে—Necissity is the mother of invention—প্রয়োজনই হলো আবিষ্কারের উৎস। প্রয়োজন থেকেই মানুষ বাঘ হয়ে দাঁড়ায়। আবার বাঘের মতো নরমাংসও খেতো! চো কো তিয়েন গুহায় সিনানথ্রোপাসের সঙ্গে তাদের নিজেদের ভাঙা-চোড়া হাড়গোড় দেখে বিজ্ঞানীরা সাব্যস্ত করেছেন, তারা নিজেদের জাতের মাংস খেতো। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আজকেও আফ্রিকার শিকারীরা বেবুন জাতীয় বাঁদরের মাংস দিব্বি আয়েস উপভোগ করে খেয়ে থাকে।—মানুষ যেন রাক্ষস। যেন ভারতীয় পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের গল্পের মত।
ব্রহ্মা প্রতিদিন সকালে নানা প্রাণী সৃষ্টি করেন—আর তারা সারাদিন

এ ওকে খেয়ে মেরে ধরে ভোরবেলা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। কিছু কিছু প্রাণী অবশ্য ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকে। আবার ভোরবেলা ব্রহ্মা নতুন ধরনের প্রাণী তৈরি করে পাঠান ;—আর তারা মারামারি হানাহানি করে নিঃশেষ হয়। শেষাশেষি ব্রহ্মা করলেন একজোড়া মানুষ—হোতা আর হেতি। বললেন, সব প্রাণীকে রক্ষা কর, চলিয়ে বলিয়ে কর। হোতা হেতি দেখে প্রাণজগতে টিঁকে থাকার জন্য সে কি হই হাংগামা। চারদিকে খালি ক্ষুৎখাম-রক্ষাম শব্দ—খাবার দাও খাবার দাও বলে যেমন ঝাঁপাঝাঁপি, তেমনি বাঁচাও বাঁচাও রক্ষা কর বলে হুড়োহুড়ি। ব্যাপার স্যাপার দেখে হোতা হেতি ব্রহ্মাকে বলে—প্রাণজগতে রাখালিয়া কাজ করা তাদের পোষাবেনা। —বাপরে, সে বড় ভয়ংকর পরিবেশ। ক্ষুব্ধ ব্রহ্মা তাদের দুজনকে বলেন, যা' তোরা রাক্ষস হ'!—

এখানেও সেই এক বৃত্তান্ত। ব্রহ্মার একদিন মানে বেশ কয়েকটি বছর। আর প্রাণ রাজ্যে যে উথাল পাথাল ডামাডোল চলছিল তার শুরু সাতলক্ষ বছর আগে—প্লাইসটোসিন যুগে। তার আগের দুই যুগের মায়োসিন আর প্লায়োসিন যুগের শান্ত পরিবেশের বদলি এ যুগে পৃথিবীতে হাজির হয় এক বিরাট আলোড়নের আবহাওয়া। পরপর চারবার এযুগে বরফস্তর নেমে এসেছিল—আর তিনবার সেগুলো গলে গিয়েছে। বরফ স্তরের ঘনত্ব কোথাও কোথাও দাঁড়িয়েছে কয়েক মাইল করে। সমুদ্র তখন বরফে ঢাকা। আবার যখন বরফ গলেছে তখন সাগর উপচানো বরফ গলানো জলে স্থলভাগে মহাপ্লাবন দেখা দেয়।—এই যুগেই নানা জাতীয় মানুষের আগমন নির্গমন ঘটেছে। বলা যায় এই সাতলক্ষ বছরটা অধিকাংশ প্রাণীশাখার বিবর্তনের পক্ষে তত বেশি না। না হোক, এই যুগের আবহাওয়া তাড়া খেয়ে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়েছে। পালাবার কালে যারা নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পেরেছে—টিঁকে গেছে ; —তবে পরিবর্তিত রূপে। বেশির ভাগই

পঞ্চত্ব পেয়েছে।—খিদের জ্বালায়, এ ওকে খেয়েছে। খাদকদের অত্যাচারে প্রাণীরা প্রাণ বাঁচাতে পালাতে চেয়েছে। সারা যুগে শুধু একটাই শব্দের অর্কেস্ট্রা—খাব খাব আর বাঁচাও বাঁচাও !—এযুগে মানুষ যদি রাক্ষস হয়—তবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

খাওয়ার জন্য কত সময় ব্যয় হতো এই বনমানুষমুখো মানুষদের---সে হিসেব টানা যায়। সি. আর. কার্পেন্টার স্টপ ওয়াচ ধরে শ্যামদেশের গিবনদের নিরীক্ষা করে দেখলেন, ওরা যতক্ষণ জেগে থাকে তার অর্ধেকসময় ব্যয় হয় খেতে, বাকি অর্ধেক আহারের স্থান আর ঘুমোবার স্থানে যাতায়াতে খরচ। গরিলাদের নিয়ে পরীক্ষা করে একই সময় তালিকা পাওয়া গেল।—আদিম মানুষদের যে এই সময়ের নির্ঘণ্টের উনিশ বিশ ঘটেছিল—এমন কথা বলা যায় না। তার উলটো-টাই সত্যি হওয়া সম্ভব। আদি আর মধ্য প্লাইসটোসিন যুগের মানুষের চোয়াল যত শক্ত বা দাঁত যতবড়ই হোক না কেন, তারা যদি কেবল কাঁচা ফলমূল আর কাঁচামাংস খেতে থাকতো তবে দিনে গড়পড়তায় শিকার আর হাতিয়ার তৈরির জন্য খুব বেশি সময় তাদের থাকতে পারে না।—অথচ মানুষের হাতিয়ার চায়। চোখালাঠি বা কাঠের বর্শা বা ফ্লিন্টের ছুরি শিকারের সুযোগ যেমন বাড়িয়েছে—তেমনি এগুলো করার জন্য সময় তাদের দরকার। অন্যদিকে সারাদিন খাই খাই হালুম হুলুম করে খাবার চিবানোর সময় তারা কমাতে তো পারে না !—তবুও তাদের কেউ কেউ ফ্লিন্ট নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে। এরা সেই প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কার করার লোক—প্রথম বিজ্ঞানী আর কারিগর !

এরা প্রথম ভাবে ফ্লিন্টের পিণ্ডকে কি ভাবে ভাঙলে কাটাকুটির অস্ত্র পাওয়া যায়। তারপর ভাবে কোন অংশের এই অস্ত্র টেঁকসই। এরা দেখে পিণ্ড ফ্লিন্টের কোমল আবরণ ছাড়িয়ে ফেলে তারপর দুচারটি চাকলা বের করে নিলে যে কেন্দ্রীয় অংশটি থাকে—যাকে আমরা বলতে পারি দাঁড়া—সেটাকে ঠোকাঠুকি করে দিব্বি টেঁকসই হাতিয়ার

বানানো যায়, আবার এদের মেরামতও করা যায়। একটি সাধারণ হাতিয়ার যেখানে গড়পড়তায় দুচারদিন টেঁকে—এই দাঁড়ার হাতিয়ার সেখামে দুচার হপ্তা টিঁকতে পারে। এমনকি দু এক মাসও টিঁকে যেতে পারে। এই সময়ে তার দুধার আলা ছুরি তৈরি করল। ইরানে এক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কালে খননে পাওয়া একধার আলা ছুরি আর দুধার আলা ছুরির অনুপাত পাওয়া যায় ১.৪। অর্থাৎ দুধার আলা ছুরি যে অনেক কাজের সেটি তারা জেনেছে। তবে একধার আলা ছুরি তৈরি করা সহজ বলে—সেটাই বেশি হয়েছে।—
দুধার আলা ছুরির পরের ধাপ হলো ফ্লিন্ট দিয়ে বর্শাফলক করা। এই ফলক তৈরি করতে করতে অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ জানলো আট মিলিমিটার পাতলা চাকলা দিয়ে বর্শাফলক করলে সেগুলো ভাঙে না অথচ শিকারের গায়ে ঢুকতে পারে।—কতদিনের পরীক্ষার পর তারা যে এটা জানলো ! পাথরের হাতিয়ারের পাশাপাশি অনেক জায়গায় শিলীভূত কাঠের হাতিয়ারও তারা বানিয়েছে। এদের পাওয়া গেছে ভারত মহাদেশে বা ব্রহ্মদেশে। বিজ্ঞানীরা ভাবেন আদি পিথেক্যানথ্রোপাসরা শিলীভূত কাঠের হাতিয়ার বানিয়েছে। আর পাথরের হাতিয়ারের শুরু সিনানথ্রপাসের কাছাকাছি কাল থেকে। বলা যায় মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ারেরও উন্নতি ঘটে। কারণ ফ্লিণ্টের বর্শা অথবা দুধার আলা ছুরি তৈরি করতে যে নিপুণতা আর সামঞ্জস্য বোধের দরকার, তার তাগিদটুকু অর্ধমস্তিষ্ক মানুষ জানলেও, তার ব্যবহারিক রূপ দিতে অক্ষম। আর আরো ভাল হাতিয়ার পাওয়া গেল কেনিয়ায়—হোমোসেপিয়েন্সদের কাছ থেকে। তাদের ছিল নুড়িদিয়ে তৈরি হাতিয়ার, যেখান থেকে পাখির ঠোঁটের অনুকৃতিতে একধরনের হাতিয়ার গড়েছে—যা দিয়ে তার কুঁদতে খুদতে পারত। অর্থাৎ এই হাতিয়ার হলো অন্য হাতিয়ারকে মসৃণ মার্জিত করার যন্ত্র ! এরই সঙ্গে তারা করে কুড়োল। ফ্লিণ্টের দাঁড়া থেকে তারা কুড়োল তৈরি করল। এই কাজ ভীষণ সময় সাপেক্ষ।

ফ্রান্সে এধরনের কুড়োল তৈরির চেষ্টা হয়েছে। দেখা যায় একজন ফরাসি কারিগরের এ জাতীয় কুড়োল তৈরির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে লাগে মোটামুটি তিনমাস। এরমধ্যে সে অবশ্য অনেক পাথর ভেঙে ছত্রখান করেছে।—সে যুগের মানুষরা কি করে এই কুড়োল করার দক্ষতা পেল ? তাদের সময় কোথায় ?···অথচ এই হাত কুড়োল পাওয়া যায় আদি প্লাইসটোসিন যুগে—বিশেষ করে প্রথম আন্তর্হিম-বাহ যুগে—আর এর ব্যবহারের শেষ দেখা যায় তৃতীয় আন্তর্হিমবাহ যুগের শেষ দিকে। অর্থাৎ মানুষকে যত বোকাসোকা ভাবা হচ্ছে —সে তত বোকা নয়। অন্তত কোনো কোনো মানুষ তো নিশ্চয় নয় !

এই হাত কুড়োলের বিশেষত্ব হলো—যেখানেই এদের পাওয়া গেছে—সেখানেই এদের গঠনে মিল আর পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। হয়তো উপাদানে পার্থক্য আছে—তবে আকার গঠনে পার্থক্য এতো যৎসামান্য —যে কোনটা প্যালেস্টাইনে পাওয়া আর কোনটা যেদক্ষিণ আফ্রিকার —সেটা বোঝা কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদেরই আওতায় ! আরো একটা তথ্য এসময়ে পাওয়া গেল। ইউরোপের তুষার সীমার নিচে নিয়্যান-ডারথাল মানুষরা থাকতো—তাদের পাথরের হাতিয়ারদের নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন মাউস্‌টারিয়ান। এদের সাহায্যে গণ্ডার পর্যন্ত তারা শিকার করতো। নিয়্যানডারথাল মানুষদের হাতিয়ারের গড়ন এক রকম ; আবার সব হোমোসেপিয়েন্সদের হাতে গড়া কুড়োল এক ধরনের। এসব দেখে বিজ্ঞানীরা ভাবেন বিভিন্ন প্রজাতির মানুষদের মধ্যে—আর সেপিয়ান্স পরিবারের সভ্যদের মধ্যে মেলামেশা ছিল। অতএব, তারা তখন কথা বলতে শিখেছে। তারা এক প্রজাতির উদ্ভাবনটিকে গ্রহণ করেছে যখন—তা যে একেবারে সাইলেন্স ফিলমের মত আকার ইঙ্গিতে ঘটে গেছে এমনটি ভাবা যায় না।—আরো একটা সন্দেহ জাগে—এই সময়ে অর্থাৎ প্লাইসটোসিন যুগের শেষ হিমবাহ কালে, যখন মানুষ এন্তার হাতিয়ার করেছে, তখন তাদের

হাতে হাতিয়ার করার সময়ও এসে গেছে। তারা আগুন পেয়েছে। আর তাদের কাছে এসেছে কতগুলো ধারণা। যেমন নিয়্যানডারথাল মানুষেরা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পর জীবন আছে, বিশ্বাস করতো প্রেতযোনীতে। তারা মৃতদেহকে কবর দিত ; সঙ্গে রাখতো তার হাতিয়ার পত্র, শিকার করা জন্তু। সে জন্তু যে কবর দেবার সময় দিয়েছে তা নয়, পরেও দিয়েছে। অর্থাৎ ডাইনি তন্ত্রের শুরুও এযুগে। কারণ তাদের হাতে তখন সময় আছে। এছাড়া এযুগে মানুষেরা সুন্দর হাতকুড়োল করেছে—গবেষণার ফলে জানা গেছে এসব কুড়োল হাতিয়ার হিসেবে মোটেই ব্যবহার হয়নি। এগুলো হয়তো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রতীক। যে নিসর্গে—প্রকৃতিতে মানুষ আছে সেই নিসর্গের সঙ্গে, তার বৃক্ষলতা পাহাড় পর্বতের সঙ্গে, মানুষের সম্পর্কের চিহ্ন। এমনটি ভাবা হয়, তার কারণ চার্লস মাউন্টফোর্ডের ডকুমেন্টারি ফিল্ম চুরুঙ্গা। অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান আদিবাসীরা পৃথিবীর আদিমতম উদ্‌বর্তিত মানব সমাজ। তাদেরও কাঠ বা পাথরের এক পবিত্র হাতকুড়োল আছে—নাম চুরুঙ্গা বা চুরিঙ্গা। এ তাদের আনুষ্ঠানিক কুঠার—যার সাহায্যে বৃদ্ধ মোড়লরা শিকারের প্রথম মাংসটুকরোটা কেটে নিত। তারপর হত সামাজিক উৎসবের শুরু। উৎসবের শেষে চুরিঙ্গাগুলো তুলে রাখতো। হয়তো সেই আদিম সনাতন ট্রাডিশন এখনো বয়ে আসছে।—এ সবই সম্ভব হলো, কারণ মানুষের হাতে সময় আছে। মানুষ আগুন পেয়েছে।

সিনানথ্রোপাসদের গুহায় আগুন ছিল। আর তৃতীয় হিমবাহযুগে আদিম মানুষের হাতে যে আগুন এসে গেছে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। বেশির ভাগ চিহ্ন পাওয়া গেছে তুষার সীমানার নিচে যারা থাকতো সেই নিয়্যানডারথালদের কাছে। হোমোসেপিয়ান্সরা সাধারণত প্রাচীনযুগে শীতের প্রভাব থেকে দূরে থাকতো বলে, তারা আগুনের ব্যবহার পরে জেনেছে বলেই বিশ্বাস। আধুনিক যুগে পৃথিবীর সব মানুষ আগুন ব্যবহার করে ; তবু কোনো কোনো

নৃজাতি আগুন জ্বালাতে পারে না। টাসমানিয়া-অস্ট্রেলিয়ার অনেক জাতির কাছে আগুন আছে—তবে আগুন জ্বালাতে জানে না। এবং জানতো না,এই সেদিনেও, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরা। —হয়তো প্রকৃতির কাছ থেকে আগুন পেয়েছে মানুষ। সেই আগুন, জ্বালানী যোগান দিয়ে, সাবধানে হেপাজং করে গেছে। এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে, এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে আগুন গেছে। বাড়ির আগুন, ক্যাম্পের আগুন নিভে গেলে ছুটে অন্য জায়গা থেকে আগুন নিয়ে এসেছে। কারণ আগুন পেয়ে মানুষ তার পাশব ভৌত অস্তিত্বের খোলসটি ফেলে দিতে পারে। আগুন তাকে নিরাপত্তা দেয়, শীতে জমে যাবার সম্ভাবনা দূর করে, আর দেয় খাদ্য পরিপক্ক করার সুযোগ। খাদ্য পরিপক্ক করার পর খেতে তার সময় দিতে বেশি হয় না। ঐ সময়টুকু বাদ দিলে বাকি সময় সে শিকারে যেতে পারে, অস্ত্রশস্ত্র মেরামত করতে পারে,এমনকি গল্পসল্প করতেও পারে।—মানুষ আর অন্য জন্তুর মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য হলো আগুনের ব্যবহার। তার দেহের বাইরের শক্তির প্রথম উৎস হলো আগুন—যা সে তার প্রয়োজনে লাগাতে পারে। মধ্য প্লাইসটোসিন যুগে তার শরীর গরম রেখেছে আগুন ; গুহার মুখে গরম আগুন জ্বেলে সে নিরপত্তা বজায় রাখতো। আর অন্ত-প্লাইসটোসিন যুগে আগুন তার কর্মদক্ষতা এনে দিল।

আর তখনই নামে শেষ হিমবাহ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শীতে জ্বালানীর অভাবে নিয়্যানডারথাল মানুষদের ক্যাম্পের পর ক্যাম্পের আগুন নিভে যায়। বাইরের ঠাণ্ডায় যাবার মত আবরণও তাদের অপ্রচুর। শিকার নেই, খাদ্য নেই ; তীব্র শীতের মোকাবেলা না করতে পেরে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।—আর তারপর আসে প্লাবন। যে সব তটরেখা শুকনো—জল সেখানে পৌঁছোয় ; উঁচু তটভূমিতে সেই জল আটকে আজও আছে—আছে গ্রীনল্যাণ্ডে আর এণ্টার্কটিকায়। জল আর কনকনে শীত—এনিয়ে প্লাইসটোসিন যুগ শেষ হতে চলে। আর্দ্র, তীক্ষ্ণতম

শৈত্য। উত্তরে যারা ছিল তারা শীতের শিকার হয়। আফ্রিকার কাছাকাছি অঞ্চলে হোমোসেপিয়ান্সরা কিছু উষ্ণ অবস্থায় ছিল। যেন শিশু। খাদ্য উষ্ণতা আর মৌল অভিজ্ঞতা অর্জনে তার সময় উদ্যম ব্যয় হয়ে গেছে। তার পরিবেশ—তার পরিবার তার সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করেছে। তার মুখে আধোআধো কথা এসেছে। সে পরিবার বানিয়েছে। ক্ষুদ্র পেশিকে হাতিয়ার নিয়ে সবল করেছে। তবু পরিবেশ বাইরের বেরুনোর পক্ষে, ছড়িয়ে যাবার পক্ষে, উপযুক্ত নয়।—তারপর একদিন শীত প্লাবনের শেষ হলো।—পাহাড় থেকে, গুহা থেকে নেমে এল মানুষ। অরণ্য প্রান্তর পেরিয়ে দূরে উঁকি দিয়ে দেখতে চায়। তার চোখের মধ্যে লেগে আছে কৌতূহল। তার চুলে খেলা করে নতুন পর্যায়ের খোলামেলা হাওয়া।

প্রথম পর্যায়ের পথ পেরিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে যে হাজির হলো, সে মূলত হোমোসেপিয়ান্স। তার আদি পুরুষদের মৃত্যু হয়েছে—বড় শীতল সে মৃত্যু! পুরনো কালকে পেছনে ফেলে সামনে পা বাড়ায় মানুষ —তার হাতে আগুন!…

(কোরাস)······ বাক্য পেল, আগুন পেল, যক্ষুনি সেই বেলা—
হিমের স্রোত চকিতে নামে ঘটায় মরণ জ্বালা।
বাপরে, কী শীত, বাপরে !
শীতের হাওয়ায় কাঁপন লাগে, উড়ায় ঘরের ঝাঁপরে ! · বাপরে !
পরনে নেই কোপনি-ট্যানা, নেই আগুনের রোশনি,
হিমের ঘায়ে বাঁচার তরে নেইতো কোথাও রোখ্‌নি !
হায়রে, বাঁচার পথ নাইরে !
বরফ গলা জলের ধারা পথ ভাসায়ে যায় রে !...হায় রে !
কপি মানুষ দিদিমারই বংশে দিতে বাতি
রইল পড়ে সেপিয়েন্স, আগুন যাহার সাথি।
বাইরে—অচিন পথে যায়রে।
হেতের মশাল নিয়ে শিশু যাত্রা করে তাইরে।...বাইরে !

(সুয়া)... ... মানুষ আইলরে
প্লাইসটোসিনের দরিয়া বাইয়া
মানুষ আইলরে !

দ্বিতীয় পর্যায় : নীড়ের সন্ধানে

হিমবাহ পার হয়ে যে এল
এলো তুষার স্রোত বেয়ে—
যে গেল দক্ষিণ থেকে উত্তরে তুষার সীমার নিচে –
তারপর ছড়িয়ে পড়ে পুবে পশ্চিমে,
ইউরোপ আফ্রিকায়, এশিয়া আর আমেরিকায় –
উত্তরের তুন্দ্রা থেকে দক্ষিণ বিন্দুতে,
যে এল বল্গা হরিণ, ম্যামথ, বুনো ঘোড়া আর
বাইসনের পিছু পিছু
পাথুরে অস্ত্র আর আগুন হাতে ; সঙ্গে কুকুর –
দ্বিতীয় প্রহরে যে এল শিকারীর সাজে—
পরশু ধনুর্ধর
সে মানুষ !—সেই এল ।

প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার বছর আগেকার কথা। প্লাইসটোসিন যুগের চতুর্থ হিমবাহের প্রথম প্রবাহ যত দক্ষিণে যেতে পারে সেখানে হাজির হলো। তার কিনারা গলতে শুরু করে। বরফ আবার ধীরে ধীরে উত্তরে হঠে যায়। যেন প্রকৃতি নামের মহাশিল্পীটি সাত লাখ বছর ধরে যে ছবিটি ক্যানভাসে আঁকলে, হঠাৎ কি খেয়ালে তার অনেকটা জায়গা হিমবাহের ইরেসারে ঘষে আর প্লাবনের জলে ধুয়ে মুছে ক্যানভাসের রঙ-দাগ মিলিয়ে মিটিয়ে নতুন ভাবে ছবিটি আঁকতে বসে। এর আগে পৃথিবীকে ভাস্করের হাতে গড়া হলো ; এখানে চিমটি কেটে পাহাড় পর্বত, ওখানে আঙুলের চাপ দিয়ে হ্রদ সাগর, আর কোনোখানে লেপে মুছে মসৃণ সমতল ভূমি। সব মিলিয়ে উঁচু নিচু এবরো খেবরো ত্রিমাত্রিক জমি—এটাই প্রকৃতির ক্যানভাস। এটিকে সে সাজায় নানা রঙে, আর সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়

প্রাণ! বড় খেয়ালী এই প্রকৃতি। কিছুতেই যেন তৃপ্তি নেই। তাই বারবার তার ক্যানভাসে নতুন রঙ ভরানো, তুলির টানে বৈচিত্র্য আনা। তাই তীক্ষ্ণ আর্দ্র শৈত্যের মুছানি দিয়ে নিয়েনডারথালদের ধুয়ে মুছে নতুন ছবি আঁকা চলে। এ যুগেও প্রকৃতি দু'বার উত্তুরের শৈত্য প্রবাহের ইরেসার দিয়ে কিছু নকশা, কিছু আলপনা মুছেছে। তবু সেই মোছা ছিল শুকনো—শুধু দাগ মেটানোর খেলা। আর নিবিষ্ট হয়ে প্লাইসটোসিন যুগশেষে নতুন ছবি আঁকে সে। কঠিন শীতের শেষে বসন্ত দেখা দেয়। বরফ পেছনে সরতে সরতে বৃক্ষলতা শূন্য তুন্দ্রাভূমি হয়ে উত্তরে সাদা রঙে ধরা পড়ে। তার পেছনে এগিয়ে গেল ছোট ছোট ঝাউ আর বালসাম গাছের বন, আরো পেছনে রইলো ওক আর অ্যাশ গাছ। বরফের কিনারায় বরফ গলা জল মাটিতে বসে গেল। সেখানে গজিয়ে ওঠে ফার্ন জাতের গাছ আর তৃণ। সেই তৃণভূমিতে চড়তে এলো বলগা হরিণ, ভেজা নরম মাটিতে গর্ত খুঁড়ে আরামে থাকতে এলো রোডেন্ট জাতের ইঁদুর। আরো একটু উত্তরের তুন্দ্রাভূমিতে ম্যামথের পাল। আর নিচের দিকের তৃণভূমিতে চড়ে বেড়ায় বুনো ঘোড়া। তাছাড়া ভালুক এল জাম আর ইঁদুর খেতে।— নতুন দিনের মানুষ উঁকি দিয়ে এসব শিকার দেখে। হাতে আগুন বর্শা ছোরাছুরি নিয়ে মানুষও এলো। তারা এলো সবরকম প্রাণী শিকার করতে। মানুষ দ্বিতীয় পর্যায়ে হাজির হলো।

প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে ভয়াবহ তুষারস্তরের প্রথম আধাআধি পিছু হঠার সঙ্গে এ যুগের আরম্ভ আর শেষ হলো আনুমানিক ছয় হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে। আর আট হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে শেষবারের মত বরফ স্তর গলে গেল। সমাপ্তি ঘটে প্লাইসটোসিন যুগের। তবু প্রকৃতি আরো দুহাজার বছর ধরে মানুষ আর প্রাণীজগৎ নিয়ে নাড়াচড়া করে কৃষি আবিষ্কারের দ্বারে মানুষকে পৌঁছুতে দেখে ছবিটি আঁকা শেষ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ মোটামুটি ছয় হাজার খৃষ্ট-পূর্বাব্দে। এই পর্যায়ে যেন ছবির দুটি খোপ। প্রথম বিরাট অংশটুকুতে

রইল জমাট বাঁধা বরফ অঞ্চলে মানুষের পা ফেলা থেকে শুরু করে তুষারের বিলুপ্তি কাল—যাকে বলা হলো ঊর্ধ্ব পুরাপলীয় যুগ। আর দ্বিতীয় ছোট খোপটিতে আঁকা রইল তুষারের সমাপ্তি থেকে কৃষির শুরু—মধ্যপলীয় যুগ। এই যুগে মানুষ দক্ষিণ থেকে উত্তরে এলো—এলো শিকার করতে। উত্তর মহাসাগর পর্যন্ত ইউরোপ এশিয়ার বিরাট ভূ-ভাগের কেন্দ্রভূমি দখল করে বেরিং প্রণালি পার হয়ে তারা আলাস্কায় পৌঁছোয়। তারপর শিকার করতে করতে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে দক্ষিণবিন্দুতে পৌঁছে গেল। যেতে পারেনি শুধু উত্তর পূর্ব কানাডার বৃক্ষহীন বরফ মোড়া প্রান্তরে, গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলে আর মধ্য আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলে। বাকি পৃথিবী সে যেন অশ্বমেধ ঘোড়া নিয়ে দখল করে নেয়। তারা ছড়িয়ে যায়—ছিটিয়ে যায়। তারা—মানে মূলত হোমোসেপিয়েন্স।—তারা উত্তরে প্রথমেই আসে। কারণ গ্রীষ্মে সেখানে শিকারের কী যে সুবিধে। একটা ম্যামথ মারা মানে সারা ক্যাম্পের লোকের কয়েক হপ্তা খাবারের জোগান। শুধু দেখতে হয় শিকারী আর তার পরিবারের লোক শীতে যেন জমে না যায়। অন্যদিকে আরো একটু দক্ষিণে আছে বল্‌গা হরিণ আর বুনো ঘোড়া—এরাও বেশ মাংসালো। তবে এদের একটু বেশি মারতে হবে—এই যা! এক মরশুমে অসংখ্য পশুমারা যায়।—তবু শীত পড়লে সেই জমাটি মাংসের গুদামের কাছাকাছি তাকে থাকতে হচ্ছে; কারণ তুষারের প্রান্তরেখা সেদিন এতদূরে—যে শীত আরম্ভ হলে সেই সীমায় পৌঁছোনো সম্ভব হতো না। ঠাণ্ডায় বেঁচে থাকা তখন এক সমস্যা। জ্বালানী কাঠ বনের গাছে আছে, ক্যাম্পে আছে আগুন। তবু শিকারীরা শিকারে বেড়িয়ে সঙ্গে আগুন নিয়ে যেতে পারে না সহজে। তার প্রয়োজন হলো গরম পোশাকের। আর পোশাক বানাবার যন্ত্রপাতির।—কোন এক জৈবিক টানে উত্তরেই সে প্রথম গেল। একদিন হিমশীতল ঠাণ্ডায় যাযাবর পাখির মত দক্ষিণে এসেছিল,

আবার ঘরের ফেরার টানে যেন উত্তরে যায়। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পৃথিবীর সব জলবায়ুর খপ্পরে পড়ে মানুষ। নতুন আবহাওয়ায় খাপ খাওয়াতে মানুষের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন হয় নানাশ্রেণীর মানুষ জাতির মিশ্রণে।

মানুষের এই যাত্রার প্রসার হোমোসেপিয়েন্সদের হাতে। এদের কপাল উঁচু, চিবুক আছে আর আছে মস্তিষ্কের পূর্ণতা। এদের পূর্বপুরুষরা ইংল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা—সেখান থেকে ভারত—এই ত্রিভুজের মধ্যে পাথরের হাত কুড়োল তৈরি করে গেছে। আর চলার পথে অন্য সব পূর্ণ মস্তিষ্ক-চিবুকহীন মানুষের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটায়। মিশ্রণ মোটামুটি ঘটে তখনো অবশিষ্ট নিয়ানডারথেল মানুষের সঙ্গে—যারা প্যালেস্টাইন থেকে ইরান—এই অঞ্চলে শীতে জবুথবু হয়ে রয়ে ছিল। আরেকটি হলো সোলো মানুষ ;—এই মিশ্রিত জাতের ঢালু কপাল আর ছোট চিবুক মানুষদের পাওয়া গেল জাপান থেকে অস্ট্রেলিয়ায়। এককথায় তুষার মুক্ত অঞ্চল অধিকার করতে বেরিয়ে হোমোসেপিয়ান্সরা অন্যজাতের পূর্ণ মস্তিষ্ক মানুষদের আত্মসাৎ করে। আবার দুজাতে মিশ্রণও ঘটে। এক অদ্ভুত মানব ঐক্য দেখা দেয়!

প্লাইসটোসিন যুগের শুরুতে মানুষ প্রকৃতির শৃঙ্খল ভেঙেছে। আবার এই যুগের শীতের স্রোতের দাপট কমলে মানুষ জঙ্গলও ছাড়ে। তারা তখন শিকারী। নানা প্রাণীর মাংস তখন তাদের খাবারের তালিকায় ঢুকেছে ; নিত্যি নতুন তালিকার বদল ঘটে। তবু এমন শিকার মানুষ খোঁজে যার মাংস দিন কয়েক রেখে খাওয়া যায়—যেমন হরিণ বাইসন। এরা থাকে জঙ্গলের বাইরে তৃণভূমিতে। মানুষও তার জঙ্গলে আবাস ছেড়ে শিকারের পেছনে ধাওয়া করে সমভূমিতে আসে। তাদের সম্বল শুধু পাথুরে অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে তারা ম্যামথও মারতো।—ম্যামথ দেখলেই মানুষরা দলবেঁধে আগুন নিয়ে বিশ্রি চিৎকার করে ধাওয়া করতো। মশালের আগুনে চোখ বেঁধে যাওয়ায় ম্যামথ দিগ্-বিদিক ভুলে দৌড়ুতে থাকতো—তার পেছনে হারে রে রে করে ধাওয়া

করে মানুষ ছোটে আর কাদায় ভরা জলভূমিতে খেদিয়ে নিয়ে যায়। একবার ঐ বিরাট শরীরের ম্যামথ যদি কাদায় পড়ে তবে সে আর উঠে আসতে পারে না—যেন ফাঁদে আটকা পাখিটি। তখন মানুষ স্বচ্ছন্দে তাকে মারতে পারে। তবু মুস্কিল হলো তাকে টেনে আনা। বাধ্য হয়ে শরীরের এক একটা অংশ কেটে কুটে মাটিতে তুলতো—আর আনন্দে হই হই করে নাচতো।—এমনি করে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে প্রাণজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় মানুষ। প্রকৃতি শৃঙ্খলের বাইরে বলে প্রকৃতি তাদের সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষ সংখ্যায় বাড়তে পারে। দলবল বাড়লে সেই অনুপাতে বেশি বেশি খাবারের বন্দোবস্তও করতে পারে। এবং পারে খাবার মজুত করতে। বরফে ঢাকা রেখে, বা আধপোড়া করে খাবার মজুত করা ছাড়া—সে তার বাসস্থানে খাবার রেখে দেয়। সে হলো গুহা। যেখানে ঢুকে পড়ে সে শীত ঝড় বৃষ্টি বন্যার হাত থেকে বাঁচে। সেই গুহায় থাকতো আগুন—যে আগুন দিত তাপ আর আলো। রাত্রি আর অন্ধকারের ভয়ের মুখোশ এঁটে আসে না ; চুপিসারে ধীরে ধীরে নিজের মনোমত দ্বিতীয় এক প্রকৃতি গড়ে তোলে মানুষ ;— গড়ে প্রকৃতির এলাকার মধ্যেই।

এতদিনে নিশ্চিন্তে সে গুহাবাসী হলো।—শুরু হলো বাসা বাঁধার পালা।...

(কোরাস)...... হিমের স্রোত প্লাবন ধারা যখন হলে সারা—
প্লাইসটোসিন রজনী শেষে জাগিলে বসুন্ধরা—
কে এল তবে পিছনে রাখি বনভূমি মর্মর ?
কে এল হোতা করিতে দখল তৃণভূমি প্রান্তর ?
কে এল সেথা ছিঁড়িয়া বাঁধন প্রকৃতির শৃঙ্খল ?—
সে বুঝি মানুষ, শুধু সেই এল, শোনো তার কোলাহল !

(ধুয়া)...... মানুষ আইল রে—
প্লাইসটোসিনের দরিয়া বাইয়া
মানুষ আইল রে !

(৭) হঠাৎ ছবির ঝলকানি

বেশ আছি আমরা। ঘরে বসে রেডিও বোতাম টিপে দিই—আর স্বচ্ছন্দে সারা পৃথিবীর কথা শুনতে পাই। হাতের খবর কাগজে চোখ বুলালেও পাই সারা দুনিয়ার খবর। আবার ছবি ভরা সিনেমার রাজ্যে এলে খবরাখবর দেখি শুনি। দেশবিদেশ হাতের মুঠোয়, চোখের নাগালে কানের কাছে এসে ফিসফিস করে কথা বলে ওঠে। —এসব হলো আজকের দিনের কথা। তবে রেডিও আর টকি—সে তো বিংশশতাব্দীর ফসল। সায়লেন্স ফিল্ম এলো ১৮৯৫ সালে। গ্রামাফোনে কথা শোনা—তাও ১৮৭৭ সালের আগে নয়। ফোটোর ছবি ১৮৩৮ এ পেলাম। আর বই ছাপা ১৪৫৬ সাল। তার আগে লেখা ছিল পুঁথিতে; তবু যত অতীতে যাওয়া যায় হাতের লেখা অবোধ্য হয়ে যায়, পুঁথির পাতা ছেঁড়াখোঁড়া। তারও পেছনে গেলে হাতের লেখাও অদৃশ্য। অতীত তখন বোবা, অন্ধ, স্থবির। কাজেই গুহা মানুষের কথা স্মৃতিতে নেই, শ্রুতিতেও নেই। আছে প্রত্নতাত্ত্বিক-দের আবিষ্কারে। এই আবিষ্কারের চিহ্ন ধরে আদি পুরুষদের গুহা বাসের স্মৃতি খুঁজতে হয়।

এই স্মৃতিচিহ্নের কাশী বা মক্কা হলো ফ্রান্সের ডরডোনি উপত্যকার লাএজাইজ গ্রাম আর তার আশপাশের অঞ্চল—ক্রো ম্যাগনন, লা মাউস্টিয়ার, লগারি হটি, লগারি বাসি, লাস্‌কক্স—এই সব অঞ্চল আর সেখানকার গুহা। চারদিকে চুনাপাথরের সাদা শৃঙ্গের মাঝ-খানে সবুজ ক্যানিয়ন। আটলান্টিকের ভেজাবাতাস উপত্যকায় বয়ে যায়, বৃষ্টি নামে। ঘাসে ভরা বনে তৃণভোজী প্রাণীরা সেইদিনও চড়ে বেড়িয়েছে। চূড়োয় উপরে দাঁড়ানো সেদিনের শিকারী মানুষটি অন্তত পাঁচমাইল দূরের বিচরণশীল প্রাণী দেখেছে—শিস দিয়ে বা ইঙ্গিতে সঙ্গীদের সেকথা জানিয়েছে। তারপর নিঃশব্দে দল বেঁধে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে,—তাড়া দিয়ে শিকারকে পাহাড়ের দেয়ালে আটক করে ফাঁদে ফেলার মত স্থানু করে ধরেছে, মেরেছে

আর কেটেছে ; তারপর শিকার করা পশুগুলো কাছাকাছি গুহায় নিয়ে গিয়ে উজ্জ্বল আগুনের ধারে বসে ওম্‌ওম্ আরামে খেয়ে দেয়ে আড্ডা মেরেছে। পাহাড়ের গায়ে হাতিয়ার বানাবার জন্য ফ্লিন্ট পাওয়া যায় ; বাইরে গুহার ধারে শীতল জলের ঝরনা।—আর কি চাইবার আছে ?

লাএজাইজ আর তার সংলগ্ন অঞ্চলের গুহাগুলো খনন করে পাওয়া গেল নানা স্তর।—একেক স্তরে একেক রকম হাতিয়ার, কংকাল, বাস-স্থানের হদ্দ হদিশ। যেন নানা সংস্কৃতির সংযোগ সূত্র হলো—এইসব গুহা।—একেবারে নিচের স্তরে পাওয়া যায় নিয়েনডারথালের পরিত্যক্ত হাড় আর ফ্লিন্ট। অর্থাৎ নিয়েনডারথাল মানুষ একদিন গুহাতে থেকে গেছে। তার উপরে ঊর্ধ্বপুরাপলীয় যুগের স্মৃতিটানা তিনটি স্তর পাওয়া গেল। যে শুষ্ক শৈত্য এযুগে প্রবাহিত হয়েছিল—যা ঘটে প্রায় চব্বিশহাজার বছর আগে—এই স্তর সেই দিনগুলির কথা জানায়। জানা যায় মানুষ উষ্ণ থাকতে চেয়ে পোশাক বানিয়েছে—কারণ এখানেই পাওয়া যায় ছোট বড় অজস্র হাড়ের সঁুচ। তাছাড়া হাজার হাজার ভাঙা হাড় থেকে বোঝা যায় তারা মাংস পরিপাক করেছে, মজ্জা চুষে খেয়েছে। এই যুগে মানুষ সাধারণত খোলামেলা জায়গা পছন্দ করে এসেছে। শুধু শীতের দিনে গুহায় বাস করত। আর কিছু পরে তারা ম্যামথ শিকারে নামে। ফ্রান্স শুধু নয়, ইউরোপের নানা অঞ্চলে খনন করে জানা যায় প্রায় বিশহাজার বছর আগে মানুষ ম্যামথ শিকার করেছে। গুহার কাছাকাছি অঞ্চলে বাড়ি বানিয়েছে ;—শীতের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য তাদের ঘরগুলি হতো মাটির নিচে, ছাদের অবলম্বন হলো গাছের কাণ্ড অথবা ম্যামথের হাড়। এই যুগে পাওয়া গেল লম্বা পাতলা গাছের পাতার মতো ফ্লিণ্টের ফলক—দু কিনারায় ধার। সম্ভবত হাতকুঠার। এর উপরের স্তরে শুষ্ক শৈত্যের তৃতীয় ভাগের চিহ্ন। হিমবাহ শেষমেশ যে হটে চলেছে তার ফেলে রাখা নিদর্শন। তৃণভূমিতে ঝাউ বনের ফাঁকে

ফাঁকে বল্গা হরিণ শিকারের এই যুগ। এই যুগে তারা হাড়ের হারপুন গড়েছিল। আর শুরু হয় বল্গা হরিণের পেছনে পেছনে মানুষের ছুটে চলা। ফ্রান্স আর ইউরোপে স্থায়ী ভাবে দেখা দেয় ওক আর অ্যাশ গাছের বন। আর দক্ষিণ থেকে হোমোসেপিয়েন্স এর দল বল্গা হরিণ-বাইসন মারতে এই অঞ্চলে চলে আসে। ধরা পড়ে মধ্যপলীয় যুগের সংস্কৃতি।

লাএজাইজে ঘুরেফিরে বিজ্ঞানীরা মনে করেন চতুর্থ হিমবাহ কালে ফ্রান্স মানব অধ্যুষিত জগতের সীমানায় ছিল। এই প্রান্তিক অঞ্চলে নানা জায়গায় জীব আর মানুষ এসেছে বা ফিরে গেছে। এ সব মানুষেরা কারো চেহারায় নিগ্রয়েড বা নিগ্রবটুর ছাপ, কেউ বা আদিতে নিয়েনডারথাল, কেউ হলো বর্তমান আইরিশ বা নরউইজিয়ানের মত প্রশস্ত মুখ ক্রোমাগনন মানুষ, কারো মুখমণ্ডল চ্যাপটা —নাকবাদে মঙ্গোলীয় মুখ, কারো চেহারায় বর্তমানের নর্ডিকদের সঙ্গে মিল। নানা জাতের মানুষ শিকারের খোঁজে এই অঞ্চলে এসেছে—আর একই গুহায় লীন হয়ে গেছে। আর সবশেষে প্রমাণ পাওয়া যায় শেষ হিমবাহ যুগে হোমোসেপিয়েন্স মানুষ অন্যান্য পূর্ণ মস্তিষ্ক মানুষকে আত্মসাৎ করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। আর দেখা যায় তাদের আঁকা গুহাচিত্র। কী এক অলৌকিক উপায়ে তারা চুনাপাথরের গুপ্ত গুহার কোণে কোণে ছবি এঁকে গেছে। এসব ছবির বয়েস ষোল হাজারেরও বেশি। রঙের টানে আছে লাল আর কালো। আছে বাইসন, হরিণের নিখুঁত ছবি—যেখানে প্রকাশ পেয়েছে নির্ভুল শারীর স্থান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান। প্রাণীদের ছবি আঁকার আগে যেন তারা বহু প্রাণী ব্যবচ্ছেদ করেছে! সেই তুলনায় কিন্তু আঁকা মানুষের ছবিগুলো তত নির্ভুল নয়—বলা যায় এগুলো যেন স্কেচ। মনে হয় মানুষ নিয়ে তাদের ঔৎসুক্য আগ্রহ ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম সিসিলির এক গুহার ছবি। সেখানে এক জটিল দৃশ্যের মধ্যে কতগুলো সুসমঞ্জস মানুষের চিত্র আছে।

আর আছে বাইসন বা হরিণ সাজা মানুষের ছবি। একটি নয় একাধিক প্রাণীসাজা মানুষের ছবি! এগুলোর মানে কি?—সেদিন কেন যে মানুষ এই ছবি এঁকেছিল!—এই তো, কিছুদিন আগে উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা বাইসন সেজে নাচতো। এরা নাচে বাইসন শিকারের অভিনয় করেছে। নাচতে নাচতে পরিশ্রান্ত হয়ে কেউ যখন পড়ে থাকার ভান করেছে তখন অন্যেরা তাকে ভোঁতা তীর ছুঁড়ে মারে, তাকে টানতে টানতে বাইরে এনে ছোরা ঘুরিয়ে লাফায়—যেন বাইসনকে টুকরো টুকরো করে কাটছে। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য আরেক জনকে ধরে।—তবু এ নাচ ঠিক সাধারণ নাচ নয়। এ নাচের তদারকি করত ওঝা। তারই কথামতো নাচ হতো—যে নাচ ভুতুড়ে তুকতাক আর ওঝালি কাণ্ড কারখানা ছাড়া অন্য কিছু নয়। উদ্দেশ্য হলো বাইসনকে যাদুকরে শিকারের ফাঁদে ফেলা। তাই শিকারে যাবার আগে তারা ঘটা পটা করে শিকারের উৎসব সেরে নেয়। শিকারে যা পেতে চায় আগেভাগে উৎসবে তা দেখতে চায়। গুহার ছবি গুলো সেই কথা কি জানায়? শিকারের আগে মাঠের শিকারের ছবি? না—এ নিছক শিল্পকৃতি?—ষোল হাজার বছর আগেকার ঘটনা। একটা স্থির উষ্ণতা আর আর্দ্রতা গুহার মধ্যে ছিল বলে সে ছবি অবিকৃত আছে। আকরিক রঙে রাঙানো, সীমানায় রেখা যেন বাটালি দিয়ে কোদা। কেন এই ছবি?

ছেলেবেলায় আমরা রূপকথার গল্প পড়েছি—যেখানে আছে ঘুমন্ত রাজকন্যা, পক্ষিরাজ ঘোড়া। আর যেখানে ব্যাঙ হঠাৎ হয়ে দাঁড়ায় সুন্দর রাজকন্যা, বানরের পোশাকে লুকিয়ে থাকে রাজপুত্র। যখন এই গল্প পড়া হয়, রুদ্ধশ্বাস বিশ্বাসে সেই জগতে শিশু ঘুরে বেড়ায়। বই বন্ধ করলে আবার ফিরে আসে বাস্তব জগৎ।—হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে তার চার পাশের জগৎ মনে হতো চেনা অচেনায় গড়ে ওঠা। বাস্তব আর কল্পনার পার্থক্য তারা টানতে শেখেনি। তারা ভেবেছে সবকিছু ভাল আর মন্দ—দুই শক্তির চালনায় ঘটে। ভেবেছে

যা কিছু ঘটে তার আদিতে আছে কোনো অপদেবতার খুশি বা রাগ। তাদের জ্ঞানের পরিধি কম ছিল বলে তুকতাকে বিশ্বাস করেছে। যেমন আজকের শিশুটি মাটিতে পড়ে গেলে মাটিকে লাথি মারে—কারণ সে ভাবে মাটিই তাকে ফেলে দিয়েছে—সেই দোষী। ছবিগুলো কি সেই তুকতাক বিশ্বাসের সূচনা জানাচ্ছে?···হয়তো বা! তবু জানার উপায় তো নেই!...

(কোরাস)······ পালে পাল বল্‌গা হরিণ নামে দেখ তৃণের মাঝে।
হাতে নে' বর্শা কুঠার ছুটে চল ব্যাধের সাজে॥
শীতের ঐ হিমেল হাওয়া কবে যে মারবে ছোবল।
তাহারে সামাল দিতে জমা কাঠ-মাংস কেবল॥
ওঝালিয়া তুলুক রে তুক মোড়লে হরিণ সাজা।
তাকে ঘিরে নাচুক মেয়ে তাকে ঘিরে মাদল বাজা॥
গুণীনে আঁকুক ছবি গুহার ঐ দেয়াল জুড়ে।
পালে পালে বল্‌গা হরিণ চেয়ে দেখ চড়ছে দূরে॥

(ধুয়া)...... মানুষ আইল রে—
প্লাইসটোসিনের দরিয়া বাইয়া
মানুষ আইল রে!

(৮) ফ্লিন্ট ফ্লিন্ট ফ্লিন্ট

গুহাবাসী মানুষের চিহ্ন যেখানে ছবি—সেটাই অবাক করা। ঐ অন্ধকার দেয়ালে কি করে ছবি আঁকলো! ছবির রঙ চিনলো কি করে? নিশ্চয় তারা আলো জ্বালিয়েছিল। তার মানে পশুর চর্বি যে প্রদীপের তেল হতে পারে আর পশুর লোম পাকিয়ে যে সলতে করা যায়—সেই বিদ্যে তাদের ঘটে এসে গেছে। তাছাড়া ছবিতে যে ঢাক জাতীয় বাজনার ছবি দেখা যায়—তাতেই বোঝা যায় চামড়ার নানা ব্যবহারও তারা জেনে ফেলেছে। তারা চামড়ার পোশাকও পরেছে।

আমরা বলি, বুকে শীত,পিঠে রোদ। আদিম মানুষরাও তাই জানতো। তারা পশুর চামড়া দিয়ে সামনেটা ঢাকতো আর পিছনটা চামড়ার ফিতের বাঁধনে বাঁধা থাকতো। আধঢাকা পোশাক—তবু শীত তো বাঁচে। ইতিমধ্যে সরু হাড় দিয়ে সুঁচ করার বিদ্যেটা কি করে জানি তাদের মাথায় আসে।—বাস, তারপর চামড়া সেলাই করে জামাটামা বানানো সহজ হয়ে ওঠে। শীতে আর ভয় নেই।

তবু অন্য ভয় তো থাকে। প্রকৃতির নিয়ম না জানলে কারুর পক্ষে পৃথিবীতে চলা সহজ নয়। প্রকৃতি যে কখন শীত আনে, আনে বর্ষা, তার হিসেব সেদিনের মানুষের মাথায় ঢোকে না। প্রতিপদে প্রাকৃতিক অদৃশ্য শক্তির সামনে নিজেকে অসহায় লাগে।—আর এই অসহায় অবস্থার মোকাবেলা করতে, প্রকৃতির বাধা জয় করতে মানুষের একটা ফন্দি জুটে গেল! তা হলো একতা। এক সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তখনো মানুষের সমাজের বোধ হয়নি। তবু এটুকু তারা জেনেছে একটা অদৃশ্য বন্ধনে সবাই যেন একজোটে বাঁধা। মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো নানা কাজ করলেও যেমন তারা একটি শরীরে বাঁধা।···দলের মানুষ নানা কাজে ব্যস্ত হলেও তারা সবাই মিলে দল।···এই দল তৈরি হলো আত্মীয়তার বন্ধন টেনে নিয়ে। দল হলো কূল। চেনাজানা পূর্বপুরুষ থেকে নেমে আসা জন্মসূত্রের বাঁধনে বাঁধা একেকটি কূল। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তারা যে শিক্ষাদীক্ষা অভিজ্ঞতা পেয়েছে সেটাই তাদের কূলাচার। ঐ আচারটাকে পালন করলে সকলের ভাল হবে—এই সরল বিশ্বাস হলো তাদের একতার মূলকথা।

তবু দল বা কূল বাড়লে খাদ্য সংগ্রহের বিপুল চাহিদাও যে বাড়ে। অতএব, কীটপতঙ্গের রাজ্যে যেমন ঘটে, মানুষের দলে সেই এক ধ'রা ধরা দেয়। দল ভেঙে, টিঁকে থাকার জন্য, মানুষ ছড়িয়ে যায়। ছড়িয়ে যায়, তবে তাদের সঙ্গে থাকে সেই পূর্বপুরুষদের নির্দেশ, তাদের গড়া হাতিয়ার, তাদের কূলাচার।—ছড়িয়ে যেতে গিয়ে দেখে পুরনো

হাতিয়ারে অনেক বাধা। অতএব অন্য হাতিয়ার বানাও।—এই সময়ে মানুষের হাতে এল বিউরিন! বিউরিন যেন একটি বাটালি যা দিয়ে হাড়, শিং, হাতির দাঁত থেকে নতুন হাতিয়ার তৈরি সম্ভব হলো। হারপুন বা বর্শা, ছোরা বা কুড়োল—সব কিছু সহজেই—মানে সেদিনের ভাষায় সহজেই—করা গেল। তাছাড়া চামড়ার ফিতে বানানোর ব্যাপারটা আগেই জেনেছে বলে বর্শা, হাত কুঠার হারপুন করা সহজ হলো। বাঁধাবাঁধির ব্যাপারে চামড়া—আর ফলক হিসেবে হাড়। সঙ্গে কাঠের বা হাড়ের লাঠি। সব মিলিয়ে চমৎকার অস্ত্র। তাছাড়া তার আছে হাড়ের বা আইভরির স্থঁচ। এই স্থঁচ দিয়ে পুরাপলীয় যুগে উষ্ণ চামড়া সেলাই করে এমন চমৎকার পোশাক তারা বানালো যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সেই পোশাক পরে শিকারীরা বাইরে বেরুতে পারতো। আর তারপর পৃথিবীর শীত প্রধান অঞ্চলে তার যাওয়াটা বিশেষ কোনো ব্যাপারই রইলো না। অন্যদিকে চামড়া দিয়ে তাঁবু করতে পারলো বলে যেখানে গুহাটুহা নেই, সেখানেও দিব্বি শীততাপ বাঁচিয়ে থেকে যেতে পারলো। ভূ-পৃষ্ঠের অনধ্যুষিত অঞ্চল দখল করা তার কাছে তখন কত যে সহজ! তাছাড়া আগুন নিভে যাওয়ার ভয় নেই। কারণ সারা পৃথিবী গাছে ভরা। গাছ মানে জ্বালানী কাঠের গুদাম। হাতে আছে কুঠার ; কাজেই গুদামের মাল সাফ করতে অসুবিধে নেই।

এই সময়ে তারা বিউরিনের এক উন্নত সংস্করণও গড়ে তোলে—যা এক চমৎকার বাটালি। এই বাটালি দিয়ে পালিশ করা পাথরের কুড়োল বানালো—যা দিয়ে অক্লেশে বাড়ি তৈরি, সালতি খোদাই করা অথবা স্লেজগাড়ি বানাবার উপযোগী গাছ কেটে লাগাতে পারে। তাছাড়া এই বাটালি দিয়ে অনেক দ্রুত সে অস্ত্র তৈরি করতে পারে।—গাছ খোদাই করে নৌকো বানাতে পারে বলে নদী আর তার বাধা নয়। তাছাড়া ভেলাও তো তৈরি করা যায়। বাঁধনের দড়িও তো হাতের কাছে আছে। শুধু চামড়া নয়। তৃণ দিয়ে সে তৈরি করে দড়ি দড়া।

আর ডালপালা দিয়ে ঝুড়ি। সেই ঝুড়ির উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে ঝুড়ি পুড়িয়ে পেয়ে গেল সুন্দর মাটির পাত্র—গায়ে তার পুড়ে যাওয়া ডালপালার হিজিবিজি দাগ।—অনেক পরে যখন মানুষ অন্যভাবে মাটির পাত্র তৈরি করলো, সেদিনও তারা সেই পাত্রের গায়ে হিজিবিজি দাগ কাটতো। তাদের ধারণা, দাগ না কাটলে সে বাসনে কিছুতেই ভাল কাজ হবে না।—সে যাক। পাথর ছাড়া মাটি দিয়েও যে পাত্র গড়া যায় সে তথ্য আদিম মানুষের কুমোরের আওতায় হাজির হয়েছে। মাটি আর আগুন—দুই তখন মানুষের দাস। আগুনের সাহায্যে সামান্য মাটিকে রূপান্তরিত করা গেল।

আর এই সময়ে এলো ধনুক। বর্শাই ছিল সেদিনের প্রধান অস্ত্র। আর আজকের দিনেও এই সেদিন পর্যন্ত টাসমানিয়ার, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিবাসী উপজাতিদের একমাত্র অস্ত্র ছিল বর্শা। আর ছিল এস্কিমোদের হাতে। তফাৎ শুধু দণ্ডের মাপে। অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ আদিম অধিবাসীরা তীরধনুকের ব্যবহার জানেনা। এই তীর ধনুক সম্ভবত উদয় হয় আফ্রিকায়। আর স্পেনের পথে হাজির হয় ইউরোপে। নিঃশব্দ নির্ভুল হাতিয়ার—যা দূর থেকে ছোঁড়া যায়। আর এখানে শিকারী অনেকটা তীর তূণে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। আগে সে বর্শা নিতে পারতো হরেদরে তিনটে বা চারটা। শিকারীর পক্ষে ধনুকের চেয়ে ভাল অস্ত্র পাওয়া কঠিন, বিশেষ করে যদি সঙ্গে থাকে সুশিক্ষিত কুকুর।—সেই কুকুরও পোষ মানলো। সে হলো উর্ধ্বপুরাপলীয় যুগের শেষে।

সব কিছু নিয়ে মধ্যপলীয় যুগে মানুষ দুর্ধর্ষ শিকারী হয়ে উঠলো। তারা ছড়িয়ে যেমন পড়লো—তেমনি শিকার করা সহজ হয়ে দাঁড়ায় বলে কারিগরির কাজে অবসর জোটে। কারিগরি কাজ মানে অস্ত্র তৈরি করা, নৌকো গড়া, চামড়ার পোশাক-তাঁবু বানানো আর ঘাসের পোশাক, দড়াদড়ি, মাটির পাত্র। তাছাড়া জল রাখার মশক বানালো বলে ছড়িয়ে পড়তে অসুবিধে নেই—জল সে বয়ে নিয়ে যেতে

পারে। অতএব মানুষ গুহা ছেড়ে ভাল করে পারি জমায়। প্রকৃতি তাকে আটকাতে পারে না।

(কোরাস) ……হাতেতে নিয়ে বর্শা কুঠার কোমরে ছুরি ছোরা
সেই তো এল করিতে দখল বিপুল বসুন্ধরা।
নতুনতর গড়ে সে হেতের আছে যে বিউরিন,
লাগিয়ে হাতল বানায় দেখি পরশু মসৃণ।
নদীর স্রোত তোলে না বাধা করে সে অবহেলা,
আছে যে তার সালতি ডিঙা নলেতে গড়া ভেলা।
চামেতে বানায় তাম্বুমশক চামেতে জামার সাজ,
তৃণেতে গড়ে দড়ি আর ঝুড়ি তৃণেতে ঢাকে লাজ।
হাড়েতে গড়ে বাটালি সূঁচ দাঁতেতে হারপুন,
তাহারি হাতে ধনুক তীর তাহারি পিঠে তূণ।
কুকুর নিয়ে শিকার সাজে তাড়ায় হরিণ ঘোড়া,
সেই যাযাবর ভ্রমিয়া বেড়ায় বিপুল বসুন্ধরা।।

(ধুয়া)…… মানুষ আইল রে—
প্লাইসটোসিনের দরিয়া বাইয়া
মানুষ আইলরে!

(৯) তেমাথার মোড়ে

বড় শীত বরফের দেশে। তবু সেখানেও বসন্তে বরফ গলে। সূর্যের আলোর আঁচ লেগে মাঠে মাঠে ঘাস গজায়; এদিক ওদিক ঝুপি ঝুপি ঝোপ ঝাড় উঁকি দেয়; গাছের ডালে নতুন পাতা বেরোয়।— এ হলো আজকের দিনের বরফের দেশের বসন্তের শুরু। আর সেদিন বিরাট বরফ ভাঙার যুগে প্রকৃতি যেন আলস্যে আড়মোড়া ভেঙেই চলে। কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়ায় না। বিশাল বিশাল নদী সব কিছু ভাসিয়ে বইতে থাকে। দেখা দেয় বিরাট বিরাট হ্রদ। আর

মার্চ করা সৈন্যের মত জমি দখল নিতে আসে ফার আর পাইন গাছ। তার নিচে লম্বা ঘন ঘাসের বন। শীত আর গ্রীষ্মের মধ্যে পাঞ্জা কষাকষি বেশ কয়েকশ বছর চললো। তারপর গ্রীষ্মের জয় হয়। পাইন গাছের ফাঁকে এ্যাসপেন গাছ মাথা তোলে। জঙ্গল নতুন করে সাজে। আর সেই জঙ্গলে বাস করতে দক্ষিণ থেকে আসে বুনোষাঁড়, বন্য বরাহ, পাটকিলে রঙের ভালুক। আর হ্রদে বিলে ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে বেড়ায় বুনোহাঁসের দল।—তাছাড়া আগের প্রাণীও তো ছিল —সেই বলগা হরিণ, সাদা ভাল্লুক, সিলমাছ, ম্যামথ আর বুনো ঘোড়া। আর সেখানে ঘুরে বেড়ায় মানুষ।

তুন্দ্রা অঞ্চল গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে যত নিচে নেমেছে, বলগা হরিণের দলও তাদের খাদ্য শৃঙ্খলের সঙ্গে সঙ্গে সরে সরে চলে এসেছে দক্ষিণে—সেখানেই তো গজায় শ্যাওলা আর ঘাস। বলগা হরিণ মারা মানুষও তাদের পেছনে পেছনে এল। আর আরো একটু দক্ষিণে বা পুবে—যেদিক বরফে জমে যায় নি সেদিকে পালে পালে চড়ে বুনো ঘোড়া আর বাইসন। একদল মানুষ গেল তাদের শিকার করতে। জন্তুর পাল ঘাসের বনে চড়ে বেড়ায়। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খাবারের খোঁজে যায়। মানুষও পেছনে পেছনে চলে। কারণ, সে যেন ঐ প্রাণীদের সঙ্গে শেকলে বাঁধা। তার স্থির হয়ে থাকার জো কি আছে? তাকে খেতে পরতে যে হবে!

জন্তুর পেছনে পেছনে চলতে চলতে একদল মানুষ মেরুপ্রদেশে চলে এল। ওদিকে যেতে তার অসুবিধে নেই। কারণ তার আছে গরম পোশাক, বর্শা ছোরাছুরি; আছে আগুন, তাঁবু আর সঙ্গে রাতে আলো করা প্রদীপ। এসেই তারা ধীরে ধীরে নিজেদের আবহাওয়ার সঙ্গে দিব্বি খাপ খাইয়ে নেয়। বরফের বাড়ি বানাতে পারলো। পারলো ভারি তাঁবু গড়তে। তাছাড়া স্লেজ গাড়ি তো ছিল। বাস, সিলমাছ টাছ মার, খাও। তবু তারা কিন্তু ঠকে গেল। যে বরফ যুগ পার হয়ে মানুষ স্বাধীন হতে চেয়েছিলে, তাদের নিজস্ব আবিষ্কার আর

আচার প্রথা নিয়ে এই মানুষের দল সেই বরফ যুগেই আটকে রইলো। মানুষের অগ্রগতির ধাপের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আর পারলো না। কারণ তারা প্রকৃতির শৃঙ্খলে বাঁধা পরে রইল। তারা শেষমেশ হলো এস্কিমো !

নিচে যারা ছিল তারা বরফের খাঁচায় বন্দী হয়ে রইলো না। শিকার প্রাণীদের পেছন পেছন ধাওয়া করে একদিন, কেমন করে না জানি, তারা ঘোড়া গরু মহিষদের পোষ মানাতে পারলো। বুনো জন্তুর পেছনে না ছুটে তাদের পোষা জন্তুর পাল চড়িয়ে তৃণভূমিতে যাযাবর হয়ে দাঁড়ালো। পোষা জন্তুরা মাংস দেয়, তাদের দুধ থেকে পাওয়া যায় অন্য খাদ্য। চামড়া জোগায় পোশাক তাঁবু মশক ; আর তৃণ থেকে পাওয়া যায় দড়ি ঝুড়ি। তাছাড়া ফাঁদ। ঐ দড়ির ফাঁদে পাখি টাখি ধরতো অথবা ধরেছে খরগোস জাতীয় ছোটখাটো প্রাণী। তবে একটাই অসুবিধা। তারা স্থির থাকতে পারে না। বুনো জন্তু অথবা পোষা জন্তুর খিদমদ করতে করতে দিন কাটে। আর সময় যায় আদিম প্রকৃতির সঙ্গে রাতদিন সংগ্রাম করে। এই যাযাবর পশু-পালকরাও, এক অর্থে শেকলে বাঁধা হয়ে রইলো। মানুষের ক্রমোন্নতির ধাপে বেশ দূর তারাও উঠতে পারে না।

আরো নিচে, আগের সমভূমিতে তখন ভীষণ জঙ্গল। সেই গহন জঙ্গলে ঢোকা যেন দুঃসাধ্য। সেখানে থাকা মানে, সব সময় গাছ কেটে জঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচার চেষ্টা করা। তাছাড়া, জঙ্গলে আছে হিংস্র শ্বাপদ। তারাও মানুষের শত্রু। গাছ কাটার জন্য, শ্বাপদদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য নতুন অস্ত্র-হাতিয়ারের প্রয়োজন হলো। এদের কাছ থেকে এল হাতলওয়ালা কুঠার। জঙ্গলে গুহা নেই। তাঁবু খাটাবার সুযোগও নেই। জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে কাঠের খুঁটি পুঁতে ডালপাতার আচ্ছাদন দিয়ে এই মানুষরা ঝুপরি ঘর তৈরি করে নেয়। জঙ্গলেও মানুষ থাকতে পারে।—

এখানে অবশ্য সমস্যা হলো খাবারের—শিকারের। ঘনজঙ্গলের জন্য

দূর থেকে শিকার দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় আওয়াজ। তাছাড়া নিমেষে যদি শিকারকে না মারা যায় তবে তা গভীর ঘন জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে যেতে পারে। এইখানে, প্রয়োজনের টানে বর্শার বদলে এল তীর ধনুক। তীর ভর্তি তূণ কাঁধে নিয়ে শিকারী শিকার করতে বার হলো। তার সঙ্গী হলো—কুকুর।—এই জঙ্গলে জীবনটাকে যারা সব ভাল বলে মেনে নিল—তারাও যেন এক শেকলে বাঁধা—তারাও স্বাধীন নয়। তারা যেন গাছগাছালি শিকার প্রাণী আর কুকুরের সঙ্গে আংটাতে আংটা আটকা শেকল। ঘনজঙ্গলের শিকারী মানুষরাও অগ্রগতির ধাপে আটকে রইলো। তারাও বেশি দূর উঠতে পারে না।

জঙ্গলে আবার সবাই যায় না। এক দল জঙ্গল ছেড়ে হ্রদ আর নদীর ধারে চলে এলো। জঙ্গল আর নদীর মাঝে সরু জমিতে তারা বাসা বাঁধে। এখানেও বিপদের হানা। নদী হঠাৎ ফেঁপে ফুলে ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বন্যা এলে মানুষ গাছের ডালে উঠে পড়ে। এমনি করে মানুষ জানে উঁচুতে থাকলে বানের জলের বিপদ কাটানো যায়। সেকাঠ কেটে উঁচু মাচান মতো করে তার উপর বাসা বাঁধলো। তার যেমন বন্যার ভয় রইলো না, তেমনি নেই শ্বাপদের ভয়। তারা তো আর মাচাতে লাফিয়ে উঠতে পারে না।—এই মাচান বাড়ি মানুষের এক বিরাট জয়।—নদীর ধারের মানুষ আদিতে ছিল প্রাণী শিকারী। যেসব জন্তু জল খেতে আসতো তাদের মেরে আহার সংগ্রহ করতো মানুষ। তারপর একদিন শিকারী জেলে হল। একই বর্শা নিয়ে প্রথম প্রথম মাছ মারতো। তারপর পাখি ধরা জালের মতো হলো মাছ ধরা জাল। সবশেষে বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা। আর এই সময় তারা নৌকোও বানালো। লম্বা এক জাতীয় গাছের গুঁড়ি খানিকটা আগুনে পুড়িয়ে, খানিকটা পাথরের কুড়োলে কেটে ডিঙি নৌকো, সালতি নৌকো বানালো মানুষ। একলহমায় প্রকৃতির টানানো প্রবেশ নিষেধ নোটিসটি মানুষ ছিঁড়ে ফেলে দেয়। জল আর

মানুষের বাধা নয়।—এই মানুষের হাতে আছে শিকারীর সরঞ্জাম, আছে জঙ্গল কাটার হাতিয়ার। আর সবার উপরে মাছ ধরার যন্ত্র-পাতি।—বড় সম্পদশালী এই নদী-ধারের মানুষরা।

এই শিকারী-জেলেরা নিজেদের মাঝে কাজ ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। কেউ শিকার করতো, কেউ বা ধরে মাছ। আর মেয়েরা ছোটরা ঝাঁকা ঝুড়ি নিয়ে জিনিস কুড়িয়ে আনতো। এইভাবে একদিন তারা মৌচাকের সন্ধান পায়। মধু তারা দুর্দিনের সঞ্চয় হিসেবে জমিয়ে রাখে। তারপর হয়তো সেই পশুপালক যাযাবরদের সঙ্গে কোনো এক আলাপের ফলে তারা পশুপালনও শেখে। নদীর ধারের মানুষরা কাজ কারবার আয়ত্ত করে নেয়।—আর সবার শেষে আনে কৃষি কাজ।

(কোরাস)......তুন্দ্রা ভাল, তৃণও ভাল, আর অরণ্য সেও যে ভাল,

তারা খোলে খাঁচার দুয়ার তারা জ্বালায় আলো।

তারা যে দেয় ইগলু তাঁবু ঝুপরি পরিপাটি—

তবু সবার চেয়ে ভাল দেখি নদীর পারের মাটি।

(ধুয়া)...... মানুষ আইল রে—

প্লাইসটোসিনের দরিয়া বাইয়া

মানুষ আইল রে!

(১০) এতটুকু বাসা

নদীর পারে যখন বসত করতে শুরু করেছে মানুষ, তখন আরো একবার বিপদ ধেয়ে এল। ছোটখাট বিপদ আপদ নয়, একেবারে মহাপ্লাবন। ৮০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্লাইসটোসিন যুগ একটা মরণ কামড় দিয়ে সমাপ্তিটা টানলো—শেষবারের মত বরফ গলে গেল। প্লাবনের ঢল নামে। যে প্লাবনের গল্প আছে বাইবেলে নোয়ার দপ্তরে, ভারতের

পুরাণে মনুর নৌকোয়। এই বারের প্লাবন মানুষকে নিঃশেষ করতে পারলো না। কারণ এটা তত জবরদস্ত তো নয়। তাছাড়া প্লাবনকে ফাঁকি দিয়ে উঁচুতে পশুটশু নিয়ে ওঠাটা হোমোসেপিয়েন্সের মাথায় এসে যায়। তার কাছে নৌকোও তো এসে গেছে, আছে মাচান বাড়ি। আর খুব একটা উত্তুরে ছিল না বলে প্লাবনের ধাক্কাও কম লাগে। তারপর একদিন প্লাবনের জল সাগরে নেমে যায়। শীর্ণকৃশ মানুষ উঁচু থেকে নেমে আসে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। এই ফিরে যাওয়াটা এবারে অনেক সহজ হয়। কারণ প্রকৃতি নিজেও তাড়াতাড়ি আগের মতন তৃণ-জঙ্গল নিয়ে সেজে দাঁড়ায়।

পুনর্বাসিত মানুষের মধ্যে যারা প্রাথমিক ভাবে কৃষির সংস্পর্শে এসেছিল তারা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সেখানে শিকার পশুপালন আর মৎস শিকার—তিনটে ধারাই ত্রিবেণীর মতো মিশেছিল। যেখানে অনেক দেরীতে কৃষি দেখা দেয় সেখানে মানুষ ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে যায়। এসব জায়গায় মধ্যযুগ হাজার হাজার বছর স্থায়ী হলো। যেমন স্টেপ্‌স্‌ অঞ্চলের যাযাবরের দল, আফ্রিকার পিগমি, এইসব। কোনো কোনো জায়গায় উর্ধ্ব পুরাপলীয় যুগের সংস্কৃতি—যা তুষার যুগের প্রাপ্তি—সেই ধারা এখনো চলেছে। যেমন এস্কিমো।

প্লাবন কেটে গেলে মানুষ আরো একবার অভিযানে যায়। কারণ শিকার প্রাণীরাও প্লাবনের পর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দূরে দূরান্তরে সরে গেছে। এই অভিযানে মানুষ যেতে পারে—কারণ তার হাতে আছে বিউরিন। সমস্ত ইউরোপীয় ভূভাগের কেন্দ্রভূমি দখল করে বেরিং প্রণালি পার হয়ে মানুষ আলাস্কায় যায়। সেখান থেকে শিকারের সন্ধানে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে পৌঁছোয় একেবারে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ বিন্দুতে। হাঁটাপথ ছেড়ে নৌকোতেও তারা মহাসাগর পারি জমানোর চেষ্টা করে। সঙ্গে শুকনো মাংস, ফলমূল। জলবহনের জন্য পাত্র ছিল চামড়ার মশক, মাটির পাত্র, ফাঁপা জলজ উদ্ভিদের নল অথবা কাঠের খোদাই করা টব। মরুভূমিতে জল বয়ে

নিতে এর অতিরিক্ত ছিল উটপাখির ডিমের খোলা। এই কালে—মোটমাট ৮০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৬০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ে – মানুষ স্থিতিশীল হতে পারছে না। তার কারণ আবহাওয়া আর পরিবেশ তখনো স্থিতিশীল হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ ভাগেও মানুষ মূলত শিকারী। পরশুরাম আর ধনুর্ধর রাম এই মানুষের কাঁধে কুড়োল আর তীরধনুক ; পাশে যুধিষ্ঠিরের কুকুর।

একদিন তাদের হাতে এল বিউরিনের চেয়ে ভাল বাটালি। বিউরিন ছিল তাদের আমেরিকা অভিযানের পাশপোর্ট। আর এই নতুন হাতিয়ার হলো কৃষি যুগে যাবার ভিসা। এই নতুন যন্ত্র হাতে পেয়ে তারা সুন্দর পালিশ করা কুড়োল আর ছুতোরের যন্ত্র বানাতে পারে। এইসব যন্ত্র নিয়ে তারা পেশাদারী জেলে হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পশুপালনেও সময় দেয়, মাথা ঘামায়। এই সময়ের কতগুলো লাঠি পাওয়া গেছে। তার গায়ে খাঁজ কাটা কাটা। যেন অঙ্কের রেখা। হয়তো এই লাঠির গায়ে তারা তাদের পশুর সংখ্যার হিসেবটা লিখে রেখে গেছে। আর পাওয়া যায় মাটির ভাঙা হাঁড়ি।

হাঁড়ির খোঁজ করতে গিয়ে শস্য বীজের খোঁজ পাওয়া গেল। ফ্রান্সের কঁপিঞে (Compigne) শহরে প্রত্নতাত্ত্বিকরা একটা হাঁড়ি পেলেন যার গায়ে শস্য বীজ আঁকা। আর পাওয়া গেল জাঁতা আর পাথরের নিড়ানি। এই অঞ্চলে ছিল শিকারী-জেলেরা। তবে তো ওরা চাষবাসও করেছে। ওরা তাহলে একধারে একে তিন—শিকারী জেলে চাষী। তবে শস্যের খোঁজটা পেল কোত্থেকে ? নিশ্চয় জঙ্গলে, তৃণভূমিতে বা নদীর ধারের ঝোপে ঝাড়ে।

হয়তো পুরুষরা শিকারে অথবা মাছ ধরতে যেতো। আর ফাঁদে আটকানো বা বাচ্চা পশু জীবন্ত ধরে এনেছে। এই সব জীবন্ত পশু তাদের দুর্দিনের খাবারের সংস্থান। দুর্দিনের জন্য পশুগুলো বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে দেখে—বাঁচিয়ে রাখা মানে ভবিষ্যতে আরো বেশি মাংস পাওয়া। তাছাড়া জীবন্ত পশু বংশবৃদ্ধি করতে পারে ; দুধের—মাংসের জোগান

দেয়। বাস—এটুকু জানার পর আরো একটা কাজ জুটে যায়—রাখালিয়া কাজ।

হয়তো মেয়েরা বাইরে থেকে জিনিস কুড়িয়ে এনেছে। সেই সঙ্গে কুড়িয়ে আনা শস্য বীজ একদিন অজান্তে মাটিতে ঝরে পড়ে গেল। তারপর দিনে দিনে সেই বীজ থেকে এল অঙ্কুর, এল গাছ, দেখা দেয় শীষ, ফুল ধরে, শস্যদানা উঁকি দেয়। এইসব মানুষ বিস্ময়ে দেখে, দেখে অভিজ্ঞতায়। দেখেশুনে একদিন মাটিতে বীজ বুনতে শিখল। আর ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হয় কৃষিকাজ।—কৃষিকাজের চৌকাঠে হাজির হয়ে মানুষ মোটামুটি স্থিতু হতে পারে। খাদ্য আছে মাটিতে—যে খাদ্যের পেছনে ছুটতে হয় না। শুধু খাটতে হয়। আর পশু আছে গোয়ালে।

ঐ চাষবাস আর রাখালিয়া কাজের জন্য মানুষের জমির দরকার হলো। জঙ্গল কেটে খেত-খামার বানাতে হয়। আবার পশু চরাবার জন্য দরকার ঘেসো মাঠ। আর দরকার হলো নতুন হাতিয়ারের—কাস্তে হাতুড়ি কোদাল নিড়ানি। নিড়ানি আসে পরে। শস্য খেতের আগাছার উৎপাত সামাল দিতে দিতে হয়রান হয়ে তারা নিড়ানির কথা ভাবে। একদিন তৈরিও করে ফেলে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে, তৃতীয় পর্যায়ের শুরুতে, মানুষ কৃষিকর্মে নামে। আর সেই খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ সালের শেষে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া আরো একবার দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল তখন মানুষ প্রকৃতির উপর তৃতীয় বার জয়ী হয়। জয়ী হয় কৃষিকর্ম আর পালিত পশুপ্রজন শিক্ষাকে টেনে নিয়ে। এতদিন মানুষ ভূত্বকের পরিবর্তন করেনি। এইবার সে পরিবর্তনের কাজে নামে। প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানায় মানুষ।

তার সম্বল হলো চারপাশে কি ঘটছে দেখা—জমিতে, নদীতে, আকাশে, বাতাসে, কীট-পতঙ্গ বা অন্য প্রাণীকূলে। এই দেখা—যা আগে ছিল ভয় ধরানো—এইবার তা হলে ভয় তাড়ানো। এই

অভ্যাস আর পর্যবেক্ষণ বা দেখা থেকে শুরু হলো উদ্যান কৃষি, পশু-পালন। আর হিসেব কষা। —কখনো পরিবর্তন হবে আবহাওয়ার ঋতুর। কখনো আসতে পারে বন্যা।

আর তখন একদল মানুষ ঘর বেঁধে গ্রাম গড়ে তোলে। এদিকে ক্ষেত ওদিকে পশু চারণের মাঠ। সেখানে রাখালের হেফাজতে পালিত পশু। নদী থেকে দূরে উঁচু জায়গায় কাঠের ঘরবাড়ি, দেয়াল ডালের উপরে মাটি দিয়ে লেপা। ঘরের সামনে উটকো জন্তুর প্রবেশ আটকাতে বেড়ার ঝাঁপ—যেন দরজা। বসতি ঘিরে খুঁটি পুঁতে পুঁতে বেড়া। নদী থেকে খাল কেটে গ্রামের কাছে নিয়ে আসা ; অথবা জলের ডোবা। বাড়িতে উনোনের ধোঁয়া, কাঁচা দুধের গন্ধ, গৃহপালিত পশুর গন্ধ। এপাশে ওপাশে ঘুরে বেড়ায় গরু ছাগল ভেড়া শুয়োর। একপাশে ডাঁই করা ছাই। আছে মাটির বাসন। উঁচুতে মাচানে সাজানো থাকে হেতের পত্তর।—ওদিকে নদী ধরে এগিয়ে গেলে ধরা যায় আরো বসতি ;—নদীর ধারে মাচা বেঁধে আছে একদল। তারা মেছো। আবার তারা শিকারী, তারা রাখাল। চাযবাস নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না তারা।—দুদলেরই আছে অবসর। আছে চাষ বাস, বীজ বোনা, বীজ কাটার উৎসব। আছে মাছ ধরার হুল্লোড়। আছে গল্প বলা, গল্প করার অবসর।

এই ঘর গেরস্থীর কালে মানুষ কাপড় বুনতে শেখে। তবে সে কাপড় তাঁতে বোনা নয়—হাতে। লম্বা ফ্রেমের ভেতর সুতোর টানা দিয়ে তারপর ছোট সুতোর পড়েন দিয়ে কাপড় বোনা। ভেড়ার লোম দিয়ে সুতো পেল শিকারীরা আর রাখালরা। আর চাষীরা পেল শনের আঁশের সুতো। তাছাড়া অন্য জন্তুর লোম থেকেও সুতো পাওয়া যায়—যে সুতো কাটা হয় টকলির মত যন্ত্র দিয়ে। এখনো এস্কিমোরা এই সুতোর কাপড় হাতে বোনে। জন্তু জানোয়ারের ছাল চামড়া দিয়ে গা ঢাকার আর দরকার হলো না।—তাদের কাপড় আছে।

চেনাজানা মানুষের দেখা পাওয়া গেল তৃতীয় পর্যায়ের শুরুতে। প্লাই-সটোসিনের দরিয়া বেয়ে নবপলীয় যুগে যে মানুষ এলো, তার নিজের ঘর আছে। হতে পারে তা ইগলু, তাঁবু, ঝুপরি, মাচান বা মাটির ছেঁচাবেড়ার ঘর।—তবু তা ঘর। তার নিজের থাকার জন্য ঘর। তার আছে প্রতিবেশী। আছে গ্রাম। আছে পুরনো দিনের গল্প। তার আছে স্থিতি আবার আছে গতি। আর আছে সাতলাখ বছরের বিরাট সংগ্রামের ইতিহাস।

টিঁকে থাকতে চেয়ে যে সংগ্রামে নেমেছিল, প্রকৃতির বন্ধন খুলতে খুলতে প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি হতে সে প্রস্তুত হয়। সে আর আটকে থাকতে চায় না। তার ঘর যেমন তার আশ্রয়, অবসর,—তেমনি যাত্রাবিন্দু। এ ঘর শুধু মানুষের ঘর।

ঘর পেয়ে মানুষ এতদিনে বড় হলো। এবার একদিন সে দৈত্য হবে। শৈশব পার হয়ে কৈশোরের শুরুতে যখন ঘরে পা দেয় মানুষ তখন তার মনে দৈত্য হবার ইচ্ছে কি ছিল?

উত্তর জানা যায় না। শুধু সেই কিশোর নতুন গড়া পাথরের হাতিয়ার গুলো নিয়ে ঘরে বাইরে তাকায়।—তার দুচোখে স্বপ্ন, দুকানে নতুন কালের সুর।—

(কোরাস)······ যে কিশোর এল প্লাবন সাঁতারি মাটি তার নির্ভর
ছোট দুমুঠোয় বিশ্ব ধরিতে তুলে লয় ধনুশর।
সেই তো সেজেছে শিকারী রাখাল অথবা মেছুয়া জেলে।
খুঁজে বুঝি পায় শস্য বীজে, মাটিতে খাদ্য মেলে।
সে গড়ে নেয় নিজ ঘর।
তার আছে যে অবসর।
যাহারা তাহারে দিয়েছে মান দিয়েছে পরিচয়,
দুহাত ভরিয়া ঢালিয়া দিয়েছে যুগযুগ সঞ্চয়,
যাহারা পেরেছে জ্বালাতে আলো ঘুচাতে অন্ধকার
চেয়েছে হঠাতে বিপুল ভীষণ বিপদ দুর্নিবার—
তারা ধরা দেয় অবসরে।
সকলি আছে সেই ঘরে।
সে কিশোর মানে ঘরের বাঁধা মানেনা তাহার টান,
দুচোখে দেখে বিপুল আকাশ দুকানে দূরের গান।
প্লাবন ঝড়ের স্মৃতির আঘাতে ভুলে যায় নিজ ঘর
চেনা অচেনার দোলনে দোলে তার যত অবসর।
সে ঘরটুকু নিয়ে মগ্ন
তার দুচোখ দূরের স্বপ্ন।

(ধুয়া)······ মানুষ আইল রে—
প্লাইসটোসিনের দরিয়া বাইয়া
মানুষ আইল রে!

———